কাব্য-প্রদীপ

(প্রথম সংস্করণ)

স্কটীশ চার্চ্চ কলেজের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের
প্রধান অধ্যাপক—
শ্রীসুধীর কুমার দাস এম্-এ প্রণীত

সন ১৩৪৩

মূল্য—৸৹ বার আনা মাত্র

শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
৯৩।৪ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত ও

ভূমিকা

কাব্যনির্ণয় গ্রন্থের বর্ত্তমান সত্ত্বাধিকারিমহাশয়ের অনুরোধে 'কাব্যপ্রদীপ' লিখিত হইয়াছে। পরিপুষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ ও প্রয়োজনানুযায়ী বাঙ্গালা অলঙ্কার শাস্ত্রের কয়েকটি আবশ্যকীয় বিষয় বাছিয়া লইয়া বর্ত্তমান গ্রন্থে পৃথগ্‌ভাবে আলোচিত হইল। কাব্যনির্ণয় গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে, এখানে তাহা পুনরুক্ত হয় নাই; যেখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন হইয়াছে সেখানে উক্ত গ্রন্থের প্রকরণের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কাব্য-প্রদীপ রচনায় বি-এ ও এম-এ পাঠার্থী জিজ্ঞাসু ছাত্রগণের প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের অলঙ্কারশাস্ত্র রচনায় পাশ্চাত্য অলঙ্কারশাস্ত্রের বিশ্লেষণ-পদ্ধতিও অনেক স্থলে প্রয়োগ করা আবশ্যক। এই বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় প্রথম পরিচ্ছেদে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে, সুধীগণ তাহা বিচার করিবেন।

ইতি বিনীত—গ্রন্থকার

সূচীপত্র

কাব্য-প্রদীপ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালা অলঙ্কার-শাস্ত্র

৭৪ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় প্রণীত 'কাব্য-নির্ণয়' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'কাব্য-নির্ণয়' বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্ব-প্রথম অলঙ্কার-গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত ও সম্মানিত। গ্রন্থরূপে প্রকাশের পূর্ব্বে 'পরিদর্শক' পত্রে ইহার অলঙ্কার-বিষয়ক পরিচ্ছেদটি দেখিয়া 'বঙ্গ শুভাকাঙ্ক্ষিণী' সভার সদস্যবৃন্দ বিদ্যানিধি মহাশয়কে একটি পারিতোষিক দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন, উক্ত অলঙ্কার-পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-প্রমুখ তৎকালীন সুধীমণ্ডলী তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার একখানি পূর্ণাঙ্গ অলঙ্কার-গ্রন্থ রচনায় প্রোৎসাহিত করেন। তদানীন্তন প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়ান্ রিফর্ম্মার্' (Nov. 28, 1862) এবং 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (Dec. 27, 1862) গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালা ভাষার প্রথম অলঙ্কার-গ্রন্থ বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

পুস্তকখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র অথবা হেমচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে নাই। কেবলমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা, অক্ষয়কুমার দত্তের তত্ত্ববোধিনী ও চারু-পাঠ, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এবং মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহ প্রকাশিত

হইয়াছিল। প্রাচীনকালের কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, বৈষ্ণব পদাবলী, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থও অবশ্য পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত প্রাচীন ও তৎকালীন আরও কতিপয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি ও সমৃদ্ধির কারণ, তাহা তখন কেবলমাত্র মধুসূদন দত্তের মধ্য দিয়া প্রভা বিকিরণ করিতেছিল। অষ্টম সংস্করণ প্রকাশের সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র উদিত হইয়া অস্তমিত হইয়াছেন, রবীন্দ্র প্রতিভা তখন মধ্য গগনে আরোহণ করিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের তখন জয়জয়কার, পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব-বন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের মরা গাঙ্গে নবযৌবন-জল-তরঙ্গের সঞ্চার হইয়াছে। এই নবতম সংস্করণে নূতন দৃষ্টি লইয়া নবীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অলঙ্কার-শাস্ত্র-রচনা বৃদ্ধ বিদ্যানিধি মহাশয়ের উদ্দেশ্য ছিল না; তিনি চাহিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রয়োগ প্রদর্শন করিতে, অথবা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের সূত্র-দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের রস ও সৌন্দর্য্য আস্বাদন করিতে। সে উদ্দেশ্য যে যথার্থরূপে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই অষ্টম সংস্করণে বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে বিচিত্র ও বহুল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া এবং কয়েকটি অতিরিক্ত বিষয় ও সংস্কৃত অলঙ্কার সূত্রনিচয়ের যোজনা করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় স্বীয় উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনাবলীর ন্যায় এই গ্রন্থও বাঙ্গালাসাহিত্যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের একটি অমূল্য দান; আমরা ইহা কৃতজ্ঞচিত্তে বারংবার স্মরণ করি। বাঙ্গালা সাহিত্যে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব পর্য্যালোচনা করিয়া সাহিত্যের ঐক্য ও অখণ্ডরূপ উপলব্ধিপূর্ব্বক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃত

অলঙ্কার শাস্ত্র (Poetics) রচনা বাঙ্গালীর বিশ্লেষণী প্রতিভা বিকাশের যুগেও অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আলোচনার জন্য অলঙ্কারশাস্ত্র বা Poetics কে আমরা মুখ্যতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়া লইতে পারি। প্রথমভাগে শব্দ, অর্থ, শব্দশক্তি—অভিধা, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা, বাক্য, ছন্দঃ, গুণ, অলঙ্কার, রীতি, ভাব ও রসের বিচার দৃষ্ট হয়। ইহাকে অলঙ্কার-শাস্ত্রের দার্শনিক বিভাগও বলা যাইতে পারে। প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণ শব্দশক্তি, রসধর্ম্ম ও অলঙ্কার-বিভাগ বর্ণনায় বিস্ময়কর পর্য্যালোচনশক্তি ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রের আচার্য্যগণ অনেকেই বড় বড় দার্শনিক ছিলেন; তাঁহারা মীমাংসা ও ন্যায়ের সিদ্ধান্ত আলোচনা করিয়া শব্দ ও বাক্যের শক্তি নির্ণয় করিয়াছেন, সাঙ্খ্য ও বেদান্তের সিদ্ধান্ত লইয়া রসতত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাচ্যে অলঙ্কারশাস্ত্র বুঝাইতে প্রধানতঃ এই বিভাগকেই বুঝায়। আমাদের আলোচ্য 'কাব্য-নির্ণয়' গ্রন্থেও প্রধানতঃ এই বিভাগেরই আলোচনা হইয়াছে। এই বিভাগেই প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণ অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকগণের আলোচনা এই বিভাগে অনেকস্থলেই স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত, ভাবের রাজ্য উত্তীর্ণ হইয়া এখনও তাঁহারা রসের দিব্যলোকে প্রবেশ করেন নাই। পাশ্চাত্য-দেশে 'Poetics' বলিতে প্রধানতঃ এই বিভাগকেই বুঝায় না, পরবর্ত্তী দুইটি বিভাগ পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকগণের নিকট সমধিক মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে।

অলঙ্কারশাস্ত্র বা poetics এর দ্বিতীয় বিভাগে কবি-চিত্ত-আলম্বনে বিষয় বস্তুর বিভিন্নরূপ ও ভঙ্গীতে প্রকাশ দৃষ্ট হয়। ইহা মুখ্যতঃ বিষয়নিষ্ঠ (objective) এবং বর্ণনাত্মক (Descriptive) সাহিত্য

মহাকাব্য, নাটক, কথা বা আখ্যায়িকায় ইহার বিচিত্ররূপ ও ভঙ্গী পরিদৃষ্ট হয়। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে মহাকাব্য, নাটক, কথা বা আখ্যায়িকার লক্ষণ বিচারে এই বিভাগের আলোচনা দেখা যায়। কিন্তু অপ্রিয় হইলেও এ কথা বলিতে হইতেছে যে, এই আলোচনা কোন কোন ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত ও অগভীর, কোথাও বা অনাবশ্যক বাহুল্য দ্বারা জটিল। আধ্যাত্মিক আলোচনায় সূক্ষ্মদর্শিতা থাকিলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে আলোচনায় ভারতীয়গণ অপেক্ষাকৃত উদাসীন। সাহিত্যে যে জীবনের বহুধাবিকাশ প্রতিফলিত হয়, এ কথা তাঁহারা উপযুক্তরূপে লক্ষ্য করেন নাই।

অলঙ্কারশাস্ত্র বা Poetics এর তৃতীয় বিভাগে বিষয়বস্তুর আলম্বনে কবি-মনের বিচিত্র প্রকাশ দৃষ্ট হয়। ইহা মুখ্যতঃ কবি-নিষ্ঠ (subjective) এবং চিন্তামূলক (reflective) সাহিত্য। গীতি-কবিতার (Lyric এর) সহস্রভেদে ইহার বিচিত্র রূপ ও লীলা প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রাচ্য অলঙ্কারশাস্ত্রে এই বিভাগের বিশিষ্ট কোন আলোচনা নাই। সংস্কৃত কাব্যরসিকগণ কাব্য আস্বাদনের বিবিধ চেষ্টা করিলেও কবিকে বুঝিবার চেষ্টা অল্পই করিয়াছেন মহাকবিগণের রচনায় গীতি কবিতা বা Lyric এর উপাদান যথেষ্ট থাকিলেও আলঙ্কারিক-গণের বিশ্লেষণে তাহা স্বীয় কলা-স্বাতন্ত্র্যে স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে নাই।

শব্দার্থ প্রভৃতি কাব্যের উপাদান, কাব্যের আলম্বন বিষয়বস্তু এবং কাব্যের স্রষ্টা কবি-মন—এই তিনের আলোচনায় অলঙ্কার-শাস্ত্র বা Poetics সম্পূর্ণ। আমরা দেখিতে পাই, প্রথম-বিভাগে সংস্কৃত আলঙ্কারিক-গণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অপেক্ষা সমধিক উৎকর্ষ—গভীরতা ও সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়াছেন ; দ্বিতীয় বিভাগে প্রাচ্যগণের প্রবেশ হইয়াছে, কিন্তু পাশ্চাত্যগণ বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন ; তৃতীয় বিভাগ সম্বন্ধে

প্রাচ্যগণের কোন উল্লেখযোগ্য দান নাই, পাশ্চাত্যগণের সমালোচন-সাহিত্য অপূর্ব্ব গৌরবের সামগ্রী। সাধারণতঃ বলা চলে, অলঙ্কার-শাস্ত্রেও ভারতীয় প্রতিভা আধ্যাত্মিক ও অন্তর্মুখী, পাশ্চাত্যপ্রতিভা মানসিক এবং ব্যবহারক্ষেত্রে দীপ্তিময়ী বিস্তারশালিনী।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্বিচার প্রয়োগমাত্রই যেমন বাঙ্গালা অলঙ্কারশাস্ত্র নহে, পাশ্চাত্য অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্বিচার প্রয়োগও সেইরূপ বাঙ্গালা অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে পারে না। কেবলমাত্র এই দুইএর সংযোগেও খাঁটি বাঙ্গালা অলঙ্কারশাস্ত্র রচিত হইতে পারে না। বাঙ্গালা অলঙ্কারশাস্ত্র এই দুইএর উপাদানে গঠিত, কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐক্য ও অখণ্ডরূপানুগত বিশিষ্ট লক্ষণানুসারে রচিত হইবে। বাঙ্গালার প্রতিভা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দান আত্মসাৎ করিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে নিজ মৌলিক দৃষ্টি ও অনুকূল পরিবর্ত্তন দ্বারা সাহিত্য-সম্পদকে সমৃদ্ধ ও বিচিত্র করিয়াছে। বিভিন্ন উপাদানে গঠিত ও বিভিন্ন রসে পরিপুষ্ট হইয়াও বাঙ্গালার সজীব মন একটি, বাঙ্গালার সজীব সাহিত্যধর্ম্ম একটি, এবং তাহা কতকাংশে স্বতন্ত্র; উপাদান ও প্রভাবের বৈচিত্র্য তাহার মনের বিচিত্র পোষণ করিয়াছে মাত্র। হৃদয়ের জারকরসে বিভিন্ন আহার্য্য দ্রব্য পরিপাক করিয়া বাঙ্গালার প্রতিভা নিজ ধর্ম্মেই উপচিত হইয়াছে। এই মনের চিন্তা, অনুভূতি ও আত্মপ্রকাশ—মনের সৃষ্টি-ধারায় স্বাতন্ত্র্য থাকিবেই। এই অনুভূতি ও আত্মপ্রকাশের বিশিষ্ট ধারাই বাঙ্গালার বিশিষ্ট সাহিত্যধর্ম্ম এবং ইহার নির্দ্দেশই বাঙ্গালা অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিশিষ্ট লক্ষ্য। বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও প্রয়োগবিজ্ঞান পর্য্যালোচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য-সূত্রের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। তখন দেখা যাইবে যে, অতি পুরাতন বিষয়ও নবীন আলোক-পাতে বিচিত্র ব্যঞ্জনা লইয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রস ও ভাব

কাব্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণ বহুপূর্ব্বে শেষ কথাটি বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের এই চরম মীমাংসা প্রকাশিত হইয়াছে রস-বাদে। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'—ইহাই প্রাচ্যগণের কাব্য-মীমাংসার শেষ সূত্র। পাশ্চাত্য কবি ও সমালোচকগণ বর্ত্তমানযুগেও রস-তত্ত্বের কোন পরিস্ফুট ধারণা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের আলোচনায় প্রাচ্য আচার্য্যগণের বিশ্লেষণের নিপুণতা এবং অন্তর্দ্দৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও গভীরতা পরিদৃষ্ট হয় না। কবি Wordsworth যেখানে বলিয়াছেন, Poetry অর্থাৎ কাব্য "takes its origin from emotion recollected in tranquility", সেখানে আলঙ্কারিকগণের কথিত স্থায়ী ভাবের রসে পরিণতির কথা অস্ফুট ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র।

রসতত্ত্বই প্রাচ্য অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়, কালোপযোগী ব্যাখ্যায় বর্ত্তমানে ইহাকে পরিস্ফুট করা আবশ্যক।

অভিনব গুপ্ত রসের সংজ্ঞা দিয়াছেন, "......স্বসংবিদানন্দচর্বণব্যাপার-রসনীয়রূপোরসঃ"। সহজ কথায়, আনন্দময় আত্মসম্বিতের আস্বাদন-রূপ একটি ব্যাপারকে রস বলা হয়। রসনীয় অর্থাৎ আস্বাদযোগ্য বলিয়া ইহার নাম রস।

আলোচনার প্রারম্ভেই মনে রাখিতে হইবে, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে যে রস আলোচিত হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠক-গত। কবি-গত রসে আচার্য্য অভিনব গুপ্ত আপত্তি করেন নাই, কিন্তু তাহার আলোচনা

কোথাও নাই। অতএব রস পাঠকের আস্বাদ্য, তাহারই অন্তরের অনুভূতিবিশেষের নাম ; ইহা কবির নহে, কাব্যের অর্থাৎ নায়কাদির ও নহে।

রসসৃষ্টির জন্য তাহা হইলে দুইটি মূল উপাদান পাওয়া যায়,—

(১) সহৃদয় পাঠকের চিত্তবৃত্তি বা 'ভাব', ইংরাজীতে যাকে বলে Emotion ; ইহা রসের মানসিক উপাদান।

(২) কবি-সৃষ্ট কাব্য-জগৎ, ইহা রসের বাহ্য উপাদান। কাব্য-জগতের এই বাহ্য উপাদানের ক্রিয়ায় সহৃদয় পাঠকের চিত্তবৃত্তি বা 'ভাব', উদ্বুদ্ধ হইয়া রসে পরিণত হয়। 'ভাব' বা Emotion রস নহে, তাহা রসোপলব্ধির পূর্ব্বাবস্থা মাত্র, যেমন তণ্ডুল অন্নের পূর্ব্বাবস্থা। পাশ্চাত্য-খণ্ডে অনেক মনস্বী এই 'ভাব' বা Emotionকে কাব্যের সার বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন।

তণ্ডুল যে প্রকার জল ও তাপের ক্রিয়ায় পরিপক্ক হইয়া আস্বাদন-যোগ্য অন্নরসে পরিণত হয়, 'ভাব'ও সেই প্রকার কবি-সৃষ্ট কাব্য-জগতের ক্রিয়ায় অলৌকিক উপায়ে রসে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। স্থায়ী ভাবের এই রসে পরিণত হওয়াকেই অলৌকিক বিভাবনা-ব্যাপার বলে।

Wordsworth এর প্রসিদ্ধ Daffodils কবিতার শেষ দুইটি পংক্তিতে, (যাহা তাঁহার পত্নীর রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ) রসাস্বাদনের পথের একটু পরিচয় পাওয়া যায়। পংক্তি দুইটী এই,—

They flash upon that inward eye,
Which is the bliss of solitude.

ড্যাফোডিল পুষ্প দর্শনের সমকালে ভাবোচ্ছ্বাস হয় অর্থাৎ Emotion জাগে, স্ফুট রসোপলব্ধি তখন হয় না। স্মৃতি-সহযোগে যখন রূপাশ্রিত

ভাবের চর্ব্বণ হয়, তখনই রসের পূর্ণ আস্বাদন জন্মে। রস চিত্তের চঞ্চল অবস্থায় পরিস্ফুট হয় না, ভাব-স্থির অবস্থায় আস্বাদিত হয়। ইহাকে তাই নির্জ্জনতার আনন্দ বলা হইয়াছে।

ইউরোপের বিখ্যাত মনীষী বেনেডেটো ক্রোচে Henry of Kleist সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া প্রারম্ভে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে ভাবের রসে পরিণতি অর্থাৎ অলৌকিক বিভাবনা-ব্যাপার এবং চর্ব্বণ-ব্যাপারটির অপেক্ষাকৃত স্ফুট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ক্রোচে লিখিয়াছেন ;—

"For poetic idealisation is not a frivolous embellishment, but a profound penetration, in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation. He who fails to accomplish this passage, but remains immersed in passionate agitation, never succeeds in bestowing *pure poetic joy* either upon others or upon himself, whatever may be his efforts." ক্রোচে-কথিত 'pure poetic joy'কেই প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণ বহু পূর্ব্বে রস-সংজ্ঞা দিয়াছেন। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য বাস্তবিকই প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন :— ক্রোচের "Poetic idealisation" আলঙ্কারিকদের 'ভাব' ও তার কারণকার্য্যের, "সকল হৃদয়-সংবাদী" 'বিভাব', 'অনুভাব' এ পরিণতি। ক্রোচের "passage from troublous emotion to the serenity of contemplation," আলঙ্কারিকদের লৌকিক 'ভাব'কে আস্বাদ্যমান 'রস'-এ রূপান্তর। "serenity of contemplation" হচ্ছে দার্শনিক-সুলভ 'মনন' বৃত্তির উপর ঝোঁক দিয়ে কথা বলা। আলঙ্কারিকদের "রস-চর্ব্বণ" কথাটি মূল সত্যকে অনেক বেশি ফুটিয়ে তুলেছে।

কবি-সৃষ্ট কাব্যজগৎ এক অলৌকিক জগৎ। লৌকিক জগতের ঘটনাবস্তুই কবি-প্রতিভার মায়াবলে স্থায়ীভাব ও সঞ্চারী ভাবের আশ্রয়ে বিভাব ও অনুভাব হইয়া অলৌকিক কাব্যজগতে রূপান্তরিত হয়। লৌকিক জগতে যাহা ছিল রতি প্রভৃতি ভাবের উদ্বোধক বা কারণ, অলৌকিক কাব্যজগতে তাহার নাম হয় বিভাব। লৌকিক জগতে যাহা ছিল, রতি প্রভৃতি ভাবের প্রকাশক বা কার্য্য, অলৌকিক কাব্য-জগতে তাহার নাম হয় অনুভাব। লৌকিক কাব্য-জগতে যে সমুদয় ছিল রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের সহকারী বা পরিপোষক, অলৌকিক কাব্যজগতে তাহাদের নাম হয় সঞ্চারী ভাব। রতি প্রভৃতি মূল ভাবগুলিকে বলা হয় স্থায়ী ভাব, কারণ বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ ভাবসমূহ যাহাকে তিরোহিত করিতে পারেনা, যাহা আনন্দরূপ অঙ্কুরের মূলস্বরূপ তাহাই স্থায়ীভাব। সাহিত্যদর্পণ-প্রণেতা বিশ্বনাথ বলেন,—

বিরুদ্ধা অবিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতু মক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ।

অভিনব গুপ্ত বলেন—"বহূনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং যথোপলভ্যতে স স্থায়ী ভাবঃ। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিরূপ অনেক ভাবের মধ্যে যে ভাবের বহুলরূপে উপলব্ধি হয়, তাহাই স্থায়ী ভাব।

ইহা সামাজিকবর্গের বাসনারূপে স্থিত অবিচ্ছিন্ন-প্রবাহ চিত্তবৃত্তি-বিশেষ। সঞ্চারী ভাব স্থায়ী ভাবের পরিপোষক মাত্র। যে সমুদয় ভাব স্বতন্ত্ররূপে মনে থাকেনা, সতত অস্থির, স্থায়ী ভাবের পরিপোষণের নিমিত্ত সমুদ্রে তরঙ্গের ন্যায় যাহাদের উদয় ও বিলয়, তাহাদিগকে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব বলে। [বিভাব ও অনুভাব সম্বন্ধে আলোচনা কাব্যনির্ণয়-গ্রন্থে ৩৪ পৃষ্ঠা হইতে দ্রষ্টব্য।]

সহৃদয় পাঠক যখন অলৌকিক কাব্যজগতে প্রবেশ করেন, তখন সর্ব্বপ্রথমে "সাধারণীকরণ" নামক একটি ব্যাপার ঘটে।

"ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদে র্নাম্না সাধারণী কৃতিঃ"

—সাহিত্যদর্পণ

ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কাব্যচিত্রিত চরিত্র বা ভাবের সহিত পাঠকের একটি সাধারণ সম্বন্ধ স্থাপনের নাম "সাধারণীকরণ"। কাব্য-বর্ণিত চরিত্র, দৃশ্য বা ভাবাদির আলোচনে পাঠক তন্ময় হইয়া স্বকীয় দেশ, কাল, অবস্থা বিশেষের সম্বন্ধ এবং ব্যক্তিস্বরূপের বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হইতে থাকেন। এই অবস্থায় অর্থাৎ বিভাবাদির সহিত সাধারণীকরণের ফলে বিভাবাদি-গত রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব পাঠকচিত্তে সূক্ষ্ম বাসনারূপে স্থিত রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের উদ্রেক করে। সহৃদয় পাঠকচিত্তে উদ্রিক্ত রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবই তণ্ডুল-স্থানীয়; ইহাই অলৌকিক বিভাবনারূপ পাকক্রিয়া দ্বারা আস্বাদনীয় রস-রূপে পরিণত হয়। বাস্তবিকপক্ষে সাধারণীকরণের ফলে চিত্তের বিক্ষেপাত্মক রজঃ এবং আবরণাত্মক তমোগুণ দূরীভূত হওয়ায় আনন্দময় সাত্ত্বিকবৃত্তির উপলব্ধি ঘটে। ইহাই রস বা রসের আস্বাদন; কারণ, আস্বাদনই রস। কথায় বলে 'ভাত পাক হয়', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাকের যাহা ফল, তাহাই ভাত; এইরূপ 'রসের আস্বাদন বা রসের অনুভূতি' এই বাক্যের ব্যবহার হয়। আচার্য্য মম্মটভট্ট বলেন,—"......পুর ইব পরিস্ফুরন্ হৃদয়মিব প্রবিশন্ সর্বাঙ্গীণমিব আলিঙ্গন্ অন্যৎ সর্বমিব তিরোদধৎ ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্ অলৌকিকচমৎকারকারী শৃঙ্গারাদিকো রসঃ... ।" "রস অলৌকিক চমৎকারকারী। আস্বাদনে মনে হয় যেন পুরোভাগে পরিস্ফুরিত হইতেছে, যেন হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে, যেন সর্ব্বাঙ্গ

আলিঙ্গন করিতেছে, অন্য সকলই যেন তিরোহিত করিতেছে, যেন ব্রহ্মাস্বাদ অনুভব করাইতেছে।" কবিরাজ বিশ্বনাথ বলেন,—

"সত্ত্বোদ্রেকাদ্ অখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ॥"

উপরে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা অতি উচ্চাঙ্গের পরিশুদ্ধ কাব্য রস। সাধারণ হিসাবে রসের অনেক পর্য্যায় ও স্তরভেদ আছে। অনেক রচনায়ই আবার ভাবের প্রাধান্য বেশি, পাঠকগণ অশ্বত্থামার দুগ্ধপানের ন্যায় ভাবকেই রস মনে করিয়া তৃপ্ত থাকেন। বস্তুতঃ কাব্য-বাগ্‌ধেনুর রস-দুগ্ধ সংসারে সুদুর্ল্লভ।

রসাস্বাদনের জন্য পাঠকের এবং কাব্য-সৃষ্টির জন্য কবির সাধারণীকরণ বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। অভিনব গুপ্ত বলেন, পাঠক যে পরিমাণে স্বকীয় মর্ত্ত্যালোক বিস্মৃত হইয়া কাব্যলোকের মধ্যে নিমগ্ন হইতে পারেন, যে পরিমাণে তাঁহার সাংসারিক ব্যক্তিত্ব ও ভেদবুদ্ধি তৎকালের জন্য লয়প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে তিনি কাব্যরস-সম্ভোগে অধিকারী হন। বার্গসোঁ (Bergson) বলিয়াছেন,—"The aim of art, indeed, is to put to sleep the active powers of our personality, and so to bring us to a state of perfect docility in which we sympathise with the emotion expressed ; while we sympathise with nature whenever she exhibits the faintest sign of human feeling or mood." ইহাই সাধারণীকরণ; ইহা কবি বা শিল্পীর সম্বন্ধেও যেমন, কাব্যরসিক বা শিল্প-রসিক সম্বন্ধেও তেমনই প্রযোজ্য। সাধারণীকরণ হইলে বাসনারূপেস্থিত রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাব

উদ্রিক্ত হয়। সাধারণ পাঠকগণ এই স্থায়ীভাবকেই রস বলিয়া ভ্রম করেন। কাব্য পাঠে রতি, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, জুগুপ্সা, হাস্য, ভয় বা বিস্ময় পূর্ব্বে জন্মিয়া থাকে; ইহারা রস নয়, স্থায়ী ভাব বা emotion মাত্র। এই emotion অলৌকিক বিভাবনাবশে রসতা প্রাপ্ত হয়। স্থায়ীভাব চিত্তবৃত্তিমাত্র, অনুকূল বা প্রতিকূল সুখ বা দুঃখবোধ জন্মায়। রস সুখদুঃখের ঊর্দ্ধে এক ঘন আনন্দ স্বরূপ চেতনা, নামতঃ আট প্রকার হইলেও মূলতঃ এক, অখণ্ড, বিজাতীয়তাশূন্য। স্থায়ীভাব বিভিন্ন বলিয়া রসেরও বিভিন্নতা পরিকল্পিত হয়। অবশ্য রস ভাবহীন নয় বলিয়া রসাস্বাদনের মধ্যে স্থায়ীভাবের বোধও হইয়া থাকে। লৌকিক শোক-ভাব দুঃখদায়ক, তাহা রস নয়। অলৌকিক বিভাবাদিবশে স্থায়ীভাব শোক করুণরসে পরিণত হয়। করুণ রসের সঞ্চারে স্থায়ী ভাবের মিশ্রণহেতু চক্ষু কখন কখন অশ্রুপ্লুত হইলেও মন অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হয়। করুণ রস যদি কেবলমাত্র শোক ভাব হইত, তবে তাহা দুঃখেরই কারণ হইত; রামায়ণাদি করুণ রসের কাব্য তাহা হইলে কেহ আগ্রহসহকারে পাঠ করিত না। সাহিত্যদর্পণ-কার বলেন,—

"করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎপরং সুখম্।
সচেতসা মনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্ ॥"
"কিঞ্চ তেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি স্যাত্তদুন্মুখঃ।
তথা রামায়ণাদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা ॥"

রসবাদ সম্বন্ধে আধুনিক সাহিত্য বিচারে অনেক জটিল প্রশ্ন রহিয়াছে, এইরূপ স্থলে তাহাদের অবতারণা সম্ভবপর নহে।

রসের উদাহরণ কাব্যনির্ণয় গ্রন্থে ৪১ পৃষ্ঠা হইতে দৃষ্ট হইবে। এখানে রবীন্দ্র সাহিত্য হইতে একটি এবং বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে একটি

উদাহরণ দেওয়া হইল। "চিত্রা" কাব্যের "রাত্রে ও প্রভাতে" কবিতাটি লওয়া যাক্ ঃ—

কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখি পরে
ধীরে পাত্র লয়েছ করে,
হেসে করিয়াছ পান চুম্বনভরা সরস বিম্বাধরে,
কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে মধুর আবেশ ভরে।
তব অবগুণ্ঠন খানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি',
আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে, তোমার কমল-কোমল পাণি।
ভাবে নিমীলিত তব যুগল নয়ন মুখে নাহি ছিল বাণী।
আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়েছিনু কেশ রাশ,
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি',
তুমি সকল সোহাগ স'য়েছিলে, সখি, হাসি মুকুলিত মুখে,
কালি মধু-যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে নবীন মিলন সুখে॥
আজি নির্ম্মলবায় শান্ত উষায় নির্জ্জন নদী তীরে
স্নান অবসানে শুভ্র বসনা চলিয়াছে ধীরে ধীরে।
তুমি বাম করে ল'য়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয় তলে উষার রাগিণী বাঁশিতে উঠিছে বাজি'।
এই নির্ম্মলবায় শান্ত উষায় জাহ্নবী তীরে আজি।

দেবি, তব সীঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ-সিঁদুর রেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি' শঙ্খবলয় তরুণ ইন্দুলেখা।
একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি' প্রভাতে দিতেছ দেখা!
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি'
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে।
আমি সম্ভ্রম ভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে
আজি নির্ম্মল বায় শান্ত উষায় নির্জ্জন নদী তীরে॥

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এ কাব্যের প্রথমাংশের আত্মা শৃঙ্গার বা আদি রস, ইহা রতি নামক স্থায়ী ভাবের পরিণতি। কাব্যের দ্বিতীয়াংশের আত্মা শান্ত রস, ইহা শম-নামক স্থায়ী ভাবের পরিণতি। শৃঙ্গার রস এবং শান্ত রস পরস্পর বিরোধী; কিন্তু এখানে আলম্বনবিভাব এক হইলেও উদ্দীপনবিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব সম্পূর্ণ পৃথক্ হওয়ায় দুইটি রস বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব বিরোধিতার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু একই কাব্যে যুগপৎ দুইটি রস সমান প্রধান হইতে পারে না। কাব্য "নানারস-নিবদ্ধ" হইলেও তাহাতে একটি রস অঙ্গী বা প্রধান হইবে, অপর রস অঙ্গ স্বরূপ হইয়া তাহাকে পোষণ করিবে। কাব্যের শেষে আসিয়া অনুভূত হয় শান্ত রসই এখানে প্রধান, মধুর রস আশ্চর্য্য ভাবে তাহার পোষকতা করিতেছে। মধু যামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে কুঞ্জকাননে যিনি প্রেয়সী, নির্ম্মলবায় শান্ত উষায় জাহ্নবী তীরে তিনিই মঙ্গলময়ী দেবী; প্রেমিক দূরে শ্রদ্ধানম্রশিরে দণ্ডায়মান। 'ক্ষণিকার' 'কল্যাণী' কবিতাটি

['বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্প কানন মাঝে, হে কল্যাণী নিত্য আছ আপন গৃহকাজে।] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কবিতাটির অন্তরালে মধুর রসের ধারা বহমান, কিন্তু উপরে শান্তরস পরিস্ফূর্ত্ত।

'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতাটির প্রথম ভাগে প্রেমিক পুরুষ ও প্রেমিকা নারী (আমি ও তুমি), বিশেষভাবে প্রেমিক পুরুষ আলম্বন বিভাব। মধু যামিনী, জ্যোৎস্নানিশীথ, কুঞ্জকানন উদ্দীপন-বিভাব। রতি স্থায়ী ভাব। রতির আলম্বন বলিয়া এবং রতিকে রসে বিভাবিত করে বলিয়া প্রেমিক পুরুষ ও প্রেমিকা নারী আলম্বন-বিভাব। রতির উদ্দীপনা ঘটায় বলিয়া মধুযামিনী প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। স্থায়ী ভাব রতির যাহা প্রকাশক অর্থাৎ আলম্বন বিভাবের যাহা কার্য্য, অবগুণ্ঠন মোচনাদি—তাহাই অনুভাব। অতএব এখানে অনুভাব—(১) প্রেমিক কর্ত্তৃক যৌবনসুরা মুখে ধরা এবং প্রেমিকাকর্ত্তৃক হাসি মুখে তাহা পান করা; (২) প্রেমিক-কর্ত্তৃক প্রেমিকার অবগুণ্ঠন টানিয়া খুলিয়া ফেলা এবং কমল-কোমল পাণি বক্ষে রাখা, প্রেমিকাকর্ত্তৃক ভাবে নয়ন নিমীলিত করা; (৩) প্রেমিক কর্ত্তৃক প্রেমিকার কেশপাশ শিথিল করা এবং মুখখানি বক্ষে রাখা, প্রেমিকা কর্ত্তৃক সহাস্য মুখে সকল সোহাগ সহ্য করা। স্থায়ী ভাবের পরিপোষণের নিমিত্ত যে সমুদয় ভাব অস্থির রূপে চিত্তে সঞ্চারিত হয়, তাহারা সঞ্চারী ভাব। এখানে আবেগ, হর্ষ, লজ্জা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব। আরম্ভেই আবেগ, হাসিতে হর্ষ, নয়ন-নিমীলনে এবং মুখ আনমিত হওয়ায় লজ্জা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত ভাব স্থায়ী নয়, সঞ্চারী; ইহারা স্থায়ী ভাব রতির সহায়ভূত হইয়া শৃঙ্গার রসকে উৎকর্ষ দান করিয়াছে। যাহা ছিল

বাস্তব জগতে 'রতি' মাত্র, তাহাই আলৌকিক কাব্য-জগতে শব্দে সমর্পিত হইয়া বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সাহায্যে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে আশ্চর্য্য শৃঙ্গার রস মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে।

উক্ত কবিতার দ্বিতীয়ভাগে প্রেমিকা নারী (তুমি), এখানে 'দেবী', তাহার সীঁথিমূলে সিন্দূর রেখা এবং বাহুতে শঙ্খ-বলয়, আলম্বন-বিভাব। নির্ম্মল বায়ু, শান্ত ঊষা, জাহ্নবী তীর, দেবালয় তলে বাঁশীতে গীত ঊষার রাগিণী উদ্দীপন-বিভাব। শম স্থায়ী ভাব। স্নান, শুভ্রবসন পরিধান, সাজি-হস্তে দেবপূজার পুষ্প-চয়ন অনুভাব। নির্ব্বেদ, মতি, ভক্তি, হর্ষ সঞ্চারী ভাব। ভক্তি, দয়া, স্নেহ প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব বলিয়া গণনা করা কর্ত্তব্য ; তাহাদের ৩৩ সংখ্যা ন্যূন সংখ্যা মাত্র। 'নির্ব্বেদ' অর্থও এখানে কঠিন বৈরাগ্য নয়, নিষ্কলুষ সাধারণ অনাসক্তি মাত্র। এইরূপে বিভাবাদির সাহায্যে শম শান্ত রসে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই শান্ত রসের একটি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য রহিয়াছে, কবির রচনায় তাহার ব্যঞ্জনা স্পষ্ট। কবি কখন বিস্মৃত হইতে দেন নাই যে, এই শান্তরসের বিভাব এখানে প্রেমিকা সুন্দরী নারী, 'দেবী'-রূপে উল্লিখিত। প্রেমিকা সুন্দরী নারী সাধারণতঃ শৃঙ্গার বা মধুর রসের বিভাব। এই প্রেমিকা সুন্দরী নারীর স্পর্শেই শান্ত রসের চিত্রের উপর এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের রশ্মিপাত হইয়াছে। কবির বর্ণনার সংযমটুকুও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। শান্ত রসের অঙ্গীভূত শৃঙ্গার রস বর্ণনায় উচ্ছ্বাস বা আতিশয্য নাই ; তাহা থাকিলে একটি কবিতায় দুইটি বিরোধী রসের অঙ্গাঙ্গিত্ব বা অন্তর্ভাব সম্ভবপর হইত না। এইরূপ জটিল অবস্থা আশঙ্কা করিয়াই আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন,—

অবিরোধী বিরোধী বা রসোঽঙ্গিনি রসান্তরে।
পরিপোষং ন নেতব্য স্তথা স্যাদবিরোধিতা॥ ধ্বন্যালোক, ৩—২৪

ইহাই আলঙ্কারিকদের পদ্ধতিতে কাব্য-বিশ্লেষণ। আধুনিক সমালোচকদের কাব্য-সমালোচনার পথ ভিন্ন; তাঁহারা রস অপেক্ষা ভাব বা emotion কে বুঝেন বেশি, এবং তাহা লইয়া হয় ভাবালুতা (sentimentalism), না হয় দার্শনিকতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনেক কবির রচনা আবার আত্ম-নিষ্ঠ (subjective), সমালোচকগণ তাহা হইতে কবির মতবাদ বিচার করিয়া কবির বাণী প্রচার করিয়া থাকেন। এই সমালোচনার যতই গুণ থাকুক, তাহা প্রকৃত রসাস্বাদন বা রসতত্ত্ব-বিশ্লেষণ নহে। উল্লিখিত কবিতা অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্র-নাথের নারীজগৎ, কান্তাপ্রেম, বস্তুতন্ত্র বা ভাবতন্ত্র আলোচনা করা হইবে। ইহা বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ-বাদী ফল-লিপ্সু বৈজ্ঞানিক যুগের প্রভাব মাত্র। অবশ্য আধুনিক কাব্যের রূপ ও রীতি অনেক জটিল।

এইবার বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী হইতে একটী পদ লওয়া যাক্।

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান-তারা!
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥

এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি
হসিত বয়ানে চাহে চন্দ্র পানে
কি কহে দুহাত তুলি॥

একদিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥

প্রাচীন কবিতা বিশেষতঃ বৈষ্ণব কবিতা অনেক সরল। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের মনস্তত্ত্বে যত জটিলতা আসিতেছে, কবিগণের রচনায়ও তত বিভিন্ন ভাবের জটিল মিশ্রণ দেখা যাইতেছে।

এই কবিতায় চণ্ডীদাস-চিত্রিত পূর্ব্বরাগের রাধিকাকে পাওয়া যায়। সমগ্র কবিতাটি রাধিকা সম্বন্ধে এক সখীর নিকটে অপর এক সখীর উক্তি। সাক্ষাদ্দর্শনে কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইয়াছে। কিশোরী রাধিকা আলম্বন-বিভাব। বিরলদেশ, কাল মেঘ, কাল বেণী, ময়ূর ময়ূরী-কণ্ঠ এবং চন্দ্র উদ্দীপন-বিভাব। ধ্যাননিশ্চল নেত্রে মেঘের পানে চাহিয়া থাকা, আহারে বিরতি, এবং রাঙ্গা বাস পরিধান করা, বেণী এলাইয়া ফুলের গাঁথনি খসাইয়া কাল চুল দেখা, দুইহাত তুলিয়া সহাস্য মুখে চন্দ্র পানে চাওয়া, একদৃষ্টিতে ময়ূর ময়ূরী-কণ্ঠ নিরীক্ষণ করা অনুভাব। রতি স্থায়ী ভাব, কিন্তু এই রতি মিলনের পূর্ব্বে দর্শন শ্রবণাদি হইতে জাত, এখানে মিলনের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় পর্য্যবসিত। চিন্তা, আবেগ, স্মৃতি (যথা—সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে), নির্ব্বেদ (যথা—বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে), উন্মাদ (যথা—হসিত বয়ানে চাহে চন্দ্র পানে কি কহে দুহাত তুলি) প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব। অনুকূল বিভাবাদিদ্বারা স্থায়ী ভাব রতি মধুর বা উজ্জ্বল রসে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই রতি মিলন জাত নহে বলিয়া উজ্জ্বল রস এখানে সম্ভোগ উজ্জ্বল নহে। ইহা দর্শন শ্রবণাদিজাত মিলনের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা-প্রসূত অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ; এই উজ্জ্বল রস তাই বিপ্রলম্ভ উজ্জ্বল।

উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে পদাবলী হইতে উদ্ধৃত বলিয়া অনুরূপ-ভাব-সম্বলিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখা যায়,—

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনঞ্চেদমিদঞ্চ শূন্য মখিলং যদ্বিশ্ব মাভাতি তে
তদ্ ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিংবা বিয়োগিন্যসি॥

এই শ্লোকটি উক্ত গ্রন্থে ব্যভিচারিবিবৃতি প্রকরণে "চিন্তা" নামক ব্যভিচারী ভাবের উদাহরণ-স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে রস

পদাবলী সাহিত্য মধ্য যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে অতিবিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পদাবলী সাহিত্য বিচারে অলঙ্কার শাস্ত্রের রসতত্ত্বের প্রয়োগ পদ্ধতি কিঞ্চিৎ ভিন্নপ্রকার। বস্তুতঃ এই উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব রসতত্ত্বই পৃথক্ ভাবে প্রয়োগ করা সঙ্গত। রসতত্ত্ব বৈষ্ণবগণের নিকটে কেবলমাত্র কাব্যাস্বাদনের অবলম্বন নহে, ইহা অখিলরসামৃতসিন্ধু ভগবান্‌কে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ সাধন। ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ। তাই বৈষ্ণবগণ পরম পুরুষের ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি অপসারিত করিয়া, তাঁহাকে কেবল মাধুর্য্যমূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আলম্বন বিভাব একমাত্র রসমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ, স্থায়ী ভাব একমাত্র রতি। বাস্তবিক বৈষ্ণবগণের নিকটে কানু ছাড়া গীত নাই; রাধিকা থাকিতে পারেন, অথবা রাধিকার স্থলে যশোদা, সুবলাদি সখা বা নারদাদি ভক্তও থাকিতে পারেন, কিন্তু সকলেরই আলম্বন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ থাকিবেনই।

বৈষ্ণবদের স্থায়ী ভাব রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি হইতে উদিত হয়।

রতি গাঢ় হইলে তাহার নাম হয় প্রেম। প্রেম এবং কামের লক্ষণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস নিম্নোক্তরূপে প্রেমের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥

* * * * *

অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥

চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

এখানে কাম লৌকিক কাম। বৈষ্ণব সাহিত্যে কাম শব্দ সাধারণতঃ বিশুদ্ধ প্রেম অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।"—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, সাধনভক্তিলহরী, ১৪৩ শ্লোক।

বৈষ্ণবগণ রতিকে ভক্ত ভেদে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন; যথা—শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুররতি। এই পঞ্চ প্রকার রতির পরিণাম বৈষ্ণবদের প্রসিদ্ধ পঞ্চরস—শান্তরস, দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস ও মধুররস। মূল স্থায়ীভাব রতির যেমন গাঢ়তার ক্রমানুযায়ী পঞ্চ বিভাগ, মূল মধুর রসেরও তেমনি পরম্পরাক্রমে পঞ্চ শ্রেণী-বিভাগ। এই পঞ্চরসই বৈষ্ণব সাহিত্যে মুখ্যরস; বীর, করুণ প্রভৃতি সপ্ত রস গৌণ রস।

রতিকে আবার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা এবং কেবলা অর্থাৎ মাধুর্য্য-স্বরূপা

এই দুই রূপে ভেদ করা হইয়া থাকে। রুক্মিণী লক্ষ্মীদেবী ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রা রতির সাধনা করেন, বৃন্দাবনের গোপীবৃন্দ কেবলা রতির ভজনা করেন। শান্ত ও দাস্যরস ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা রতির পরিণাম; সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস কেবলা রতির পরিণাম। কেবলা রতি ভয় সম্ভ্রম ও সঙ্কোচ-শূন্য, মাধুর্য্যস্বরূপ মাত্র; ভগবান্ সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণের ইহাই পরম আবিষ্কার। প্রত্যেকটি রসের নিজ নিজ বিশিষ্ট গুণ রহিয়াছে। শান্ত রসের বিশিষ্ট গুণ শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা, দাস্যের বিশিষ্ট গুণ শ্রীকৃষ্ণসেবা, সখ্যের বিশিষ্ট গুণ শ্রীকৃষ্ণে সঙ্কোচ হীন বিশ্বাস, বাৎসল্যের বিশিষ্ট গুণ শ্রীকৃষ্ণে মমতাধিক্য এবং মধুর রসের বিশিষ্ট গুণ শ্রীকৃষ্ণে অখণ্ড আত্মসমর্পণ। বেদান্ত মতে আকাশাদিভূতের গুণ যেমন পর পর ভূতে সংক্রামিত হয়, বৈষ্ণব মতে সেইরূপ শান্তাদি রসের গুণ পর পর রসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য ঘটিয়া মধুররসে রসতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা হয়। নিম্নে এই ক্রম স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইল:—

আলম্বন বিভাব	স্থায়ী ভাব		গুণ	রস
শ্রীকৃষ্ণ ও সাধক	শান্ত রতি	ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা	শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা (১)	শান্ত রস
,, ও উদ্ধবাদি ভক্ত	দাস্য রতি	ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা	(১) ও শ্রীকৃষ্ণ সেবা (২)	দাস্য রস
,, ও শ্রীদামাদি সখা	সখ্য রতি	মাধুর্য্যস্বরূপা কেবলা	(১), (২) ও শ্রীকৃষ্ণে সঙ্কোচহীন বিশ্বাস (৩)	সখ্য রস
,, ও যশোদাদি গুরুজন	বাৎসল্য রতি	মাধুর্য্যস্বরূপা কেবলা	(১), (২), (৩) ও শ্রীকৃষ্ণে মমতাধিক্য (৪)	বাৎসল্য রস
,, ও রাধিকাদি গোপীগণ	মধুর রতি	মাধুর্য্যস্বরূপা কেবলা	(১), (২), (৩), (৪) ও শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ (৫)	মধুর রস

দ্রষ্টব্য :—রতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে বলে বিষয়ালম্বন বিভাব, রতির পাত্র কৃষ্ণভক্তগণকে বলে আশ্রয়ালম্বন-বিভাব।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে বৈষ্ণবরসতত্ত্ব সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে; এখানে তাহার জটিলাংশের অবতারণা সম্ভবপর নহে। নিম্নে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতগ্রন্থ, মধ্যলীলা উনবিংশ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীরূপশিক্ষার অবশ্য জ্ঞাতব্য অংশ উদ্ধৃত হইল,—

ভক্ত ভেদে রতি ভেদ পঞ্চ পরকার
শান্ত রতি, দাস্য রতি, সখ্য রতি আর ॥
বাৎসল্য রতি, মধুর রতি পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণ ভক্তি রস পঞ্চ ভেদ।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রস নাম।
কৃষ্ণ ভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥
শান্ত ভক্ত নব যোগেন্দ্র সনকাদি আর।
দাস্য ভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার ॥
সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্য ভক্ত পিতা মাতা যত গুরুজন ॥
মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন ॥
পুনঃ কৃষ্ণ রতি হয় দুই ও প্রকার।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রা, কেবলা ভেদ আর ॥
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠান্তে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ ॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান প্রধানাতে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি ॥
শান্ত দাস্য রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহাও উদ্দীপন।
বাৎসল্যে সখ্যে মধুর রসে সঙ্কোচন ॥

বসুদেব দেবকীর কৃষ্ণ, চরণ বন্দিল ।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হৈল ॥
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয় ।
সখ্য ভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয় ॥
কৃষ্ণ যদি রুক্মিনীরে কৈল পরিহাস ।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিনীরে হৈল ত্রাস
কেবলা শুদ্ধপ্রেম ভক্ত ঐশ্বর্য্য না জানে ।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে ॥
শান্ত রসে স্বরূপবুদ্ধে কৃষ্ণৈক নিষ্ঠতা ।
"শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধে" রিতি শ্রীমুখ-গাথা ॥
কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা ত্যাগ তার কার্য্য মানি ।
অতএব শান্ত, কৃষ্ণ ভক্ত, এক জানি ॥
স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণ ভক্ত নরক করি মানে ।
কৃষ্ণ নিষ্টা, তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে ॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্ত জনে ।
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে ॥
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধ হীন ।
পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ॥
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্ত রসে ।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ॥
ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর ।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর ॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন ।
অতএব দাস্য রসে হয় দুই গুণ ॥

কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ।
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্য রসের তিন গুণ চিন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্য রসে বশ ভগবান্॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার।
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥
আপনাকে পালকজ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণ ভক্তবশ গুণ কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে॥
মধুর রসে কৃষ্ণ নিষ্ঠা যেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥
এই ভক্তি রসের কৈল দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাব্য-রূপ

কাব্যকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মুখ্যতঃ দুই জাতিতে বিভক্ত করিয়া থাকেন, বিষয়নিষ্ঠ (objective) এবং আত্ম-নিষ্ঠ (subjective)। যে কাব্যে বিষয়বস্তু অর্থাৎ নিসর্গ কিংবা জাগতিক ঘটনা প্রধান হইয়া প্রকাশ পায়, কবি-চিত্ত আলম্বন বা উপলক্ষ্য মাত্র, তাহাই বিষয়নিষ্ঠ কাব্য (objective poetry)। এইরূপ সৃষ্টিতে কবিচিত্তের স্বতন্ত্র সত্তা, বৈশিষ্ট্যবোধ অথবা নিজস্ব অনুভূতি ও চিন্তা প্রায় থাকেনা; কবিচিত্ত যেন বিষয় বস্তুর সহিত অভিন্ন হইয়া যায়, বিষয় বস্তুই স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। বিষয়-নিষ্ঠ কাব্য তাই নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal), বিষয়ের মধ্যেই কবি আত্মভাবের সম্পূর্ণ সার্থকতা বরণ করিয়া থাকেন। সভ্যতার আদি ও মধ্যযুগে এই বিষয়নিষ্ঠ সাহিত্যের আরম্ভ, বিকাশ ও সমৃদ্ধি। নিসর্গের অভিনব উল্লাস কিংবা প্রাকৃতিক ও জাগতিক ঘটনা-নিচয়ের প্রবল অভিঘাতে কবিচিত্ত বিস্ময়ে ও ভয়ে স্তব্ধ হইয়া তাহারই বর্ণনায় মুখর হইয়া উঠে। সভ্যতার পরিণত অবস্থায় কিন্তু কবির ব্যক্তিত্ব-বোধ পরিস্ফুট হইয়া স্বকীয় দৃষ্টি দ্বারা বিষয়কে অনুরঞ্জিত করিতে থাকে, এইরূপ কাব্যের নাম আত্ম-নিষ্ঠ কাব্য (subjective poetry)। কিন্তু কাব্যমাত্রকেই বিষয়নিষ্ঠ অথবা আত্মনিষ্ঠ বলিয়া চিহ্নিত করা অসমীচীন। কারণ ভাব-জটিল আধুনিক কাব্যে, এমন কি অপেক্ষাকৃত সরল প্রাচীন কাব্যেও অনেক সময়ে উভয়বিধ উপাদান সংমিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়।

কাব্যের মধ্যে গাথাকাব্য ও মহাকাব্য প্রকৃত বিষয়নিষ্ঠ কাব্য, রোমান্স-কাব্য ও নাট্যকাব্যও এই জাতির অন্তর্গত। ইহা ভিন্ন প্রায় যাবতীয় অভিনয়াত্মক (dramatic) এবং বর্ণনাত্মক (narrative) সাহিত্য অর্থাৎ নাট্য ও কথাসাহিত্য বিষয়নিষ্ঠতা (objectivity) ধর্ম্মেই সমুজ্জ্বল।

গাথা-কাব্য (Ballad)

ইহাই মানব সভ্যতায় সাহিত্য বা কাব্যপদবাচ্য প্রথম সৃষ্টি। ইহা ছন্দোবদ্ধ বলিয়া কাব্য, এবং লোকমুখে গীত হইত বলিয়া গাথা-নামে প্রচলিত। ইহা, সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেষের কীর্ত্তি-জ্ঞাপক সত্য-মূলক কাহিনী-অবলম্বনে ঋজুতা, দ্রুততা, আবেগ এবং নাটকীয় ভঙ্গী ও পরিস্থিতিপূর্ণ সংক্ষিপ্ত বা অসংক্ষিপ্ত রচনা।

ইহাতে প্রেম, বিদ্বেষ, প্রভৃতি জীবনের সহজ ও সরলভাবগুলি, কখন কখন যুদ্ধবিগ্রহ অথবা দুঃসাহসিকতাপূর্ণ বীর ভাবগুলি অতি সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়া থাকে। প্রাচীন গাথাগুলিতে অলৌকিক উপাদানও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষায় প্রাচীনযুগের গাথা 'গোপীচাঁদের গীত' বা 'ময়নামতীর গান' প্রভৃতি; মধ্যযুগের গাথা 'মহুয়া' 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী' প্রভৃতি মৈমনসিংহ-গীতিকা অথবা 'শান্তি" 'নীলা', 'ভেলুয়াসুন্দরী' বা 'চৌধুরীর লড়াই' প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা।

মঙ্গল কাব্য

প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে ইহা মহাকাব্যের স্থান অধিকার করিয়া আছে; কিন্তু কাব্য-কলা হিসাবে ইহাকে মহাকাব্য বলা যায় না। ইহার আকৃতি বৃহৎ, আখ্যানভাগও প্রচুর, নানাবিধ চরিত্র ও রসের সমাবেশএবং বর্ণনায় নাটকীয় কৌশলও ইহাতে দৃষ্ট হয়,

তৎকালীন সমাজের নিখুঁত চিত্র এবং আশা ও আদর্শও ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে, তবু ইহা শিল্প-দৃষ্টিতে প্রকৃত 'মহাকাব্য'-পদ-বাচ্য নহে। অধিকাংশ মঙ্গল কাব্যেই আখ্যানবস্তু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ঐক্যরূপ লাভ করিয়া তাহা সুসংহত হয় নাই, চরিত্রগুলি অনেক স্থলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য-শূন্য, নারী চরিত্রে মাধুর্য্য রক্ষিত হইলেও পুরুষ চরিত্রে পৌরুষ এবং ধীরোদাত্ত নায়কের গুণ দুর্ল্লভ, আখ্যান-বস্তুর বিক্ষিপ্ততার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই একটি রস অঙ্গী বা প্রধান হইতে পারে নাই, লৌকিক ও অলৌকিক অথবা প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত বস্তুর সামঞ্জস্য-হীনতার জন্য অনেক স্থলে ভাব ও রসে পরিণত হইতে পারে নাই। এক কথায় বলা চলে ইংরাজী এপিক্‌কাব্যে যাহাকে sublimity বা সমুন্নতি বলে, তাহা মঙ্গলকাব্যের আখ্যানবস্তু, চরিত্র, ভাব ও রস এবং ভাষা কোথাও অখণ্ডরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। এইজন্য ইহাকে 'মহাকাব্য' না বলিয়া 'মঙ্গলকাব্য' নামে স্বতন্ত্র কাব্যশিল্প হিসাবেই আলোচনা করা উচিত।

কয়েকটি লক্ষণ-বিচারে ইহাকে ইংরাজী 'Epic of growth' এর সমশ্রেণীর কাব্য বলা যাইতে পারে। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যই 'একলা কবির কথা নহে,' একটি কবির রচনাও নহে। এক সময়ে যাহা ছোটখাট ব্রতকথা মাত্র ছিল, তাহাই বিভিন্নযুগের কবিগণের কাব্য-চেষ্টার ফলে ষোলপালা গানরূপ বৃহৎ মঙ্গলকাব্যে পরিণত হইয়াছে; এবং শেষ প্রতিভাবান্ কবি পূর্ব্ব কবিগণকে আচ্ছন্ন করিয়া একাই সমগ্র যশের অধিকারী হইয়াছেন।

মঙ্গলকাব্য প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত পুরাণ-ধর্ম্মী কাব্য-সাহিত্য, ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা দেশের পুরাণ বলা চলে। বিবিধ দেব-দেবীর বন্দনা করিয়া সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনা দ্বারা কাব্য আরম্ভ করা হয়, কাব্যে

তৎকালীন ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সমাজের লৌকিক বা পৌরাণিক অবস্থা চিত্রিত থাকে। কোন দেবতার মহিমা কীর্ত্তন এবং তাঁহার পূজা প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য। দেবতা বিশেষের মঙ্গল-গান থাকে বলিয়াই কাব্যের নাম দেবতার নামের শেষে মঙ্গলশব্দ-যোগে রচিত হইয়া থাকে। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল বাঙ্গালা ভাষার তিনখানি শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্য। পরবর্ত্তী যুগের অন্নদামঙ্গলকাব্যও কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট, যদিও ইহা একলা কবির রচনা এবং মঙ্গলকাব্যের প্রকৃত আবেষ্টন-শূন্য, তাই কৃত্রিম।

মঙ্গলকাব্যে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণনার সূত্রে সুকৌশলে কাব্যাধিদেবতার অবতারণা করা হয়। দেবতা মর্ত্ত্যলোকে পূজাপ্রচারের নিমিত্ত চেষ্টিত হ'ন এবং কোন দেবকুমার বা দেবকন্যা অথবা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাকে দেবতার চক্রান্তে অনুষ্ঠিত অপরাধের ছলে অভিশাপ দিয়া স্বর্গভ্রষ্ট করেন, অভিশপ্ত দেবযোনিরা মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া কাব্যের নায়ক নায়িকা হইয়া থাকেন। প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেই এই একরূপ ভূমিকা দৃষ্ট হয়। কবি দেবতার নিকট হইতে স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন।

মূল দেবতার সহিত প্রধান নায়কের সংঘর্ষই মঙ্গলকাব্যের আখ্যান-বস্তুর প্রাণ। দেবতার নানা নিগ্রহ ও অনুগ্রহের কাহিনী এবং নায়কের প্রবল প্রতিরোধ ও আত্মগত প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মধ্য দিয়া আখ্যান বস্তু পুষ্টি লাভ করিতে থাকে। প্রায়ই মঙ্গলকাব্যে দেবতার ভক্ত অপর নায়ক বিশেষতঃ নিষ্ঠাবতী নায়িকার চরিত্র উজ্জ্বলরূপে বর্ণিত হয়, এবং তাহারই সাহায্যে সকলের মঙ্গল মিলনে মূল সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে।

মঙ্গলকাব্যের আখ্যান বস্তুর ন্যায় রচনা-প্রণালীতেও অনেক বাঁধা রীতি আছে, যথা,—সুখের বা দুঃখের বারমাসী গান, চৌতিশা স্তুতি, নারীগণের

পতিনিন্দা বর্ণনা, বিবিধ চিত্রলিখিত কাঁচুলির বর্ণনা, রন্ধনদ্রব্যের তালিকা, রন্ধনপ্রণালীর উল্লেখ এবং ফুল ফল পশু পক্ষীর তালিকা সন্নিবেশ ইত্যাদি। পয়ার ও ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ এবং ক্লাসিকাল ও রোমাণ্টিক উভয় রীতির সন্নিবেশ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিগণ অনেক সময়ে জানিয়া শুনিয়া দেবচরিত্রের ছলে মানুষ চরিত্র—সেই যুগের বাঙ্গালীর গৃহস্থালীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কাল্পনিক কথা সৃষ্টি করিয়া কবিগণের পর্য্যবেক্ষণ ও চরিত্র নির্ম্মাণশক্তি প্রদর্শন করিবার সুযোগ ছিল না বলিয়াই অনেক সময়ে এই উপায় অবলম্বন করা হইত। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র তাই অন্নদামঙ্গল কাব্যে একস্থলে বলিতেছেন,—

"হর লয়ে **নরলীলা** করিবারে চাই।
তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই॥"

অবশ্য দেবচরিত্র ছাড়াও নিছক মানুষ চরিত্র হিসাবে মঙ্গলকাব্যে ভাড়ুদত্ত প্রভৃতি দুই একটি চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে।

মঙ্গলকাব্য মূলে গান, দিন দুই পালা করিয়া আট দিনে ষোল পালায় গীত হইত।

মহাকাব্য বা এপিক

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে মহাকাব্যের লক্ষণ কাব্যনির্ণয় গ্রন্থের ৫ম ও ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। "রাবণ-বধ", "নিবাতকবচ বধ", "বৃত্র-সংহার", "বীরকুমার বধ", "পৃথ্বীরাজ" প্রভৃতি মহাকাব্য উক্ত লক্ষণানুসারে রচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য "মেঘনাদবধ" সম্বন্ধে এই কথা বলা চলেনা। অবশ্য মেঘনাদবধ কাব্যে মহাকাব্যের কতিপয় লক্ষণ সুস্পষ্ট; কবি কাব্যকে

দ্বিতীয় সংস্করণে নয়সর্গে সমাপ্ত করিয়া এবং প্রতিসর্গশেষে সংস্কৃত ভণিতা প্রয়োগ করিয়া কাব্যের মহাকাব্যত্ব প্রমাণিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু কাব্যের সাড়ম্বর আরম্ভ এবং বিষাদ পূর্ণ সমাপ্তি, কাব্যের নায়ক ও প্রতিনায়ক নির্ব্বাচন, তাহাদের চেষ্টা প্রভৃতি সংস্কৃত মহাকাব্য অপেক্ষা গ্রীক এপিক্ লক্ষণ সমধিক পরিস্ফুট করে। মধুসূদন যে সাক্ষাৎভাবে এরিষ্টোটল-কৃত এপিক্-লক্ষণ অনুসরণ করিয়া মহাকাব্য রচনার চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রথম রচিত মহাকাব্য তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের আলোচনা হইতেও বুঝিতে পারা যায়। তিনি তাঁহার বন্ধু মনস্বী রাজ নারায়ণ বসুমহাশয়কে লিখিতেছেন,— "When you get your copy of Tilottama you must send me a regular Aristotelian letter about the fable, the characters, the sentiments and the language." এই জন্য মধুসূদন কৃত মহাকাব্যের লক্ষণ নির্ণয় করিবার জন্য পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকদের সম্মত (১) আখ্যান বস্তু (Fable), (২) নায়কাদি চরিত্র (Characters), (৩) রস ও ভাব (sentiments) এবং (৪) ভাষা (Language) ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রকৃত এপিকে তাহার আখ্যানবস্তু, নায়কাদি চরিত্র, রস ও ভাব এবং ভাষা সকলেরই একটি সাধারণ লক্ষণ চাই sublimity অর্থাৎ গৌরব বা সমুন্নতি।

নিম্নে প্রাচ্য মহাকাব্য ও পাশ্চাত্য এপিক্ উভয়ের লক্ষণ বিচার করিয়া বাঙ্গালা মহাকাব্যের স্বরূপ আলোচনা করা হইল।

আখ্যানবস্তু— ইহা সরলও হইতে পারে, জটিলও হইতে পারে। জটিল আখ্যানবস্তু মহাকাব্যের অধিকতর উপযোগী। বিবিধ সংঘর্ষ ও

ভাগ্য বিপর্য্যয়, ঘটনার নব নব পরিস্থিতি দ্বারা জটিল আখ্যানবস্তু সহজেই পাঠকের ভাব-সাগর উদ্বেলিত করিতে পারে। আলঙ্কারিক দণ্ডী যেখানে বলিয়াছেন, শত্রুর বংশ, বীর্য্য, বিদ্যা প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়া তাহার জয় দ্বারা নায়কের উৎকর্ষ বর্ণিত হইলে তাহা প্রীতিকর হয়, সেখানে এই জটিল আখ্যান বস্তুর রসাবহত্বেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আখ্যান বস্তুর পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকা চাই। বিশ্বনাথ বলেন, "ইতিহাসোদ্ভবংবৃত্ত মন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্।" কাল্পনিক আখ্যানবস্তু মহাকাব্যের ভাবগৌরব রক্ষা করিয়া রসনিষ্পাদনে অসমর্থ। মহাকাব্যে অতিপ্রাকৃত বা দৈব উপাদান থাকিলে তাহা যেন মানববুদ্ধির ধারণার অতীত না হয়।

ভামহ প্রভৃতি সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতে নায়কের জয় ও প্রতিষ্ঠা দ্বারা কাব্য সমাপ্তি ঘটাইতে হইবে। সংস্কৃত নাটকের ন্যায় সংস্কৃত মহাকাব্যেও ট্রাজেডির স্থান নাই। পাশ্চাত্যগণ এই মত স্বীকার করেন না, বরং ট্রাজেডিই মানবজীবনের গভীর রহস্যের ছায়াপাত করে বলিয়া তাঁহাদিগের মতে রসনিষ্পাদনে সমধিক উপযোগী। বাঙ্গালা সাহিত্যে কিন্তু মেঘনাদবধ, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস ট্রাজেডি। বৃত্রসংহারও কি ট্রাজেডি নয়? সংস্কৃতে "রঘুবংশম্" কাব্যও কি ট্রাজেডি নয়?

এই আখ্যান বস্তুর তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণ—একত্ব (unity), সমগ্রত্ব (entirety) এবং গৌরব (sublimity)। মহাকাব্য-বর্ণিত ঘটনা মূলতঃ একটিমাত্র ঘটনা হইবে, তাহা সমগ্ররূপে বর্ণিত হইবে, তাহা সর্ব্বত্র গৌরব বা মহত্ত্বোদ্দীপক হইবে।

(১) **একত্ব** (unity)—বহুর মধ্যে যে একত্ব তাহাই শিল্পজগতের

একত্ব তাহা বর্ণনার বৈচিত্র্যের মধ্যে পরিকল্পনার মূল সূত্র স্বরূপ। মহাকাব্যে যে প্রধান পুরুষের অবদান কীর্ত্তিত হয়, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া কাব্যান্তর্গত সমুদয় চরিত্র ও ঘটনা একত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এরিষ্টটল এবং হোরাস্ বলেন, কবিগণ এই একত্বের জন্য আরম্ভেই ঘটনাপুঞ্জের অন্তঃস্থলে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। তাঁহারা এমন একটি পরিস্থিতি নির্ব্বাচন করেন, যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাচয়ের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাচয়ের অমোঘ বীজস্বরূপ, সমগ্র কথাবস্তু যেন তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। কবি তখন সুকৌশলে কোন প্রধান চরিত্রের মুখ দিয়া ভূত বা ভাবী ঘটনা বর্ণনা করাইয়া আখ্যানবস্তুকে সমগ্ররূপ দিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যেই পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী ঘটনা যোজনা করিবার জন্য মেঘনাদবধ কাব্যে অশোকবন নামক চতুর্থ সর্গ বর্ণিত হইয়াছে, এবং রৈবতক কাব্যে পূর্ব্বস্মৃতি নামক সপ্তম সর্গের অবতারণা করা হইয়াছে। পাঠকের কৌতূহল দৃষ্টিও আরম্ভ হইতেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অবশ্য এই আরম্ভ কাব্যকলার দিক্ হইতে; গল্পের দিক্ হইতে মনে হইবে, কাব্য যথাস্থানেই আরব্ধ হইয়াছে।

এই একত্ব আখ্যানবস্তুর ঘটনা-গত। আখ্যানবস্তুর কাল-গত একত্বও আছে। গ্রীক্ ট্রাজেডির ন্যায় গ্রীক্ এপিকেও ঘটনার এক দিবস-ব্যাপিত্বের কথা উঠে না। কিন্তু মহাকাব্যে দীর্ঘকালব্যাপিত্ব অথবা সর্গদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান থাকা উচিত নহে, তাহাতে ঘটনা নিশ্চয়ই সংহতি লাভ করিতে পারে না। কাল-গত ঐক্য সম্বন্ধে মেঘনাদবধ আদর্শ কাব্য, পর পর তিনটী দিনের ঘটনায় কাব্যের নয়সর্গ সমাপ্ত হইয়াছে।

(২) **সমগ্রত্ব (Entirety)**—ঘটনাবস্তু যখন সর্ব্বাবয়বে সম্পূর্ণ হয়, তখনই তাহাকে সমগ্র বলা চলে। এই সমগ্রত্বের জন্য ইহার একটি

আদি, মধ্য ও অন্ত অর্থাৎ আরম্ভ, বিকাশ ও পরিণতি চাই। ঘটনাবস্তুর সহিত যাহা সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধযুক্ত নহে, এমন কিছু কাব্যমধ্যে স্থান পাইতে পারে না। আবার ঘটনাবস্তুর সম্যক্ পরিপুষ্টির জন্য যে বিষয়ের অবতারণা আবশ্যক, তাহাও কোনরূপে বর্জ্জিত বা সংক্ষিপ্ত হইতে পারে না।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ মহাকাব্যে নাটকীয় পঞ্চসন্ধির কথা উল্লেখ করিয়া এই একত্ব ও সমগ্রত্বকে আরও বিশদ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) **গৌরব** (sublimity)—সুদৃঢ় বিরাট সৌধের ন্যায় মহাকাব্যের আখ্যানবস্তুও কেবল সমগ্ররূপে মহত্ত্বপূর্ণ হইলেই চলিবে না, তাহার প্রত্যেকটি অংশই ঐরূপ হওয়া আবশ্যক। তাহার ক্ষুদ্রতম অংশেও মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য্য, মহিমা ও সমুন্নতি থাকিবে। যাহা কিছু তরল, লঘু ও প্রগল্ভ, যাহা অতি সাধারণ ও অতি তুচ্ছ, তাহা মহাকাব্যের বলিষ্ঠতার বিরোধী। মহাকাব্য পাঠে আত্মা সুদৃঢ় ও সমুন্নত হইবে ; মধুর কোমল কান্তের ললিত বিলাস সেখানে থাকিতে পারে না।

এরিষ্টটল্ বলেন, কেবল মাত্র বিষয়-গৌরবই যথেষ্ট নয়, ইহার কালব্যাপিত্বও প্রয়োজন। প্রকৃত ঘটনার কাল পরিমাণ অল্প হইতে পারে, কিন্তু শক্তিশালী কবিগণ প্রসঙ্গসূত্রে দেবদানব, স্বর্গপাতাল, এবং বিচিত্র ঘটনাপুঞ্জের অবতারণা করিয়া রচনাকে এমন ভাবে ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত করেন, যেন পাঠকচিত্ত সহজেই কাব্যপাঠে গাঢ়ভাবে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারে।

অনেক সময়ে এই সমুন্নতির প্রথম সূচনা হয় মহাকাব্যের আরম্ভের আড়ম্বরে। বিষয়বস্তুর নির্দ্দেশ, বাণীর মুখ হইতে কাব্য শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ, বাণী ও তাহার সহচরীর বন্দনা, কবির বিনয় ও প্রচ্ছন্ন গর্ব্বোক্তি এই আড়ম্বরের অন্তর্গত।

সূর্য্যোদয়, সন্ধ্যা, বিভিন্ন ঋতু, মৃগয়া, শৈল, সমুদ্র, নগর, যজ্ঞ, যুদ্ধ যাত্রা, স্বর্গ প্রভৃতি বর্ণনা করিতে বলিয়া প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণ মহাকাব্যের এই গৌরব-পুষ্টির কথাই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী সমালোচকগণ এই বিষয়-গৌরবকে প্রাধান্য দেন; এরিষ্টটল্ প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী সমালোচকগণ কিন্তু চরিত্রাঙ্কনে অভিনয়োচিত কল্পনা ও নাটকীয় কৌশলকে অধিক প্রাধান্য দিয়া থাকেন। মেঘনাদবধ-কাব্যে মূল আখ্যানবস্তু যেমনই হোক্, অংশগুলির পরিকল্পনায় এবং সমগ্রের সুষ্ঠু ও সবল প্রকাশ ভঙ্গীতে তাহা অতুলনীয়।

আখ্যানবস্তু নাতিস্বল্প নাতিদীর্ঘ অন্যূন নয়সর্গে বিভক্ত হইবে। মহাকাব্যের নাম বিষয়বস্তুর নামানুসারেই হইয়া থাকে। অনেক সময়ে সর্গ-বর্ণিত কথানুসারেও সর্গের নামকরণ হয়।

নায়কাদি চরিত্র (Characters)

দণ্ডী, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ বলেন, মহাকাব্যের নায়ক ধীরোদাত্তগুণান্বিত হইবে। ধীরোদাত্তগুণ অবশ্যই মহাকাব্যের গৌরব-ব্যঞ্জক, কিন্তু কেবল একবিধ চরিত্রাঙ্কনদ্বারা মহাকাব্যের বিশাল পরিপ্রেক্ষিত পূর্ণ হইতে পারে না। তাই অসাধারণত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির চরিত্রের সমাবেশ প্রয়োজন; এই অসাধারণত্ব যেন অস্বাভাবিক বা অসম্ভব না হয়। একদিকে অতি প্রকৃত ও পরিচিত, অপর দিকে অতিপ্রাকৃত ও অপরিচিত উভয়বিধ সীমার মধ্যবর্ত্তী এবং নিজবৈশিষ্ট্যে বিস্ময়কর চরিত্রাবলী মহাকাব্যের সম্যক্ উপযোগী। মহাকাব্যের চরিত্রাবলী সবলতা দুর্ব্বলতার সংমিশ্রণে দোষে গুণে সমুজ্জ্বল না হইয়া উৎকর্ষাতিশয়সম্পন্ন বা কেবল অপকর্ষসম্পন্ন হইলে, পাঠকের হৃদয়ে আশা আকাঙ্ক্ষা বা সহানুভূতির সঞ্চার করিতে পারে না। ট্রাজেডিতেও দুর্ব্বার

নিয়তিশক্তির সহিত পরিশুদ্ধ আদর্শ চরিত্রের সামঞ্জস্য শোভন হয় না।

মহাকাব্য অতিশয় বস্তু-নিষ্ঠ বলিয়া তাহাতে রূপক ও ছায়াবাদের কোন স্থান নাই। একান্ত অলীক বা কাল্পনিক চরিত্র মহাকাব্যোচিত সত্যতা ঘোষণা করিতে পারে না; আখ্যানবস্তু এবং চরিত্রনিচয়ের অন্ততঃ পৌরাণিক ভিত্তি থাকা চাই।

নাটকীয় বর্ণনাভঙ্গী যথেষ্ট না থাকিলে মহাকাব্য মিলযুক্ত গল্পে পর্য্যবসিত হয়, কবির প্রধান কার্য্য চরিত্রগুলিকে রঙ্গভূমিতে অবতারিত করা, অতঃপর পরস্পর প্রীতি ও বিদ্বেষবশে তাহারাই কথা বলিয়া ও কার্য্য করিয়া ঘটনা বস্তুকে দুর্নিবার গতিতে অগ্রসর করিয়া দিবে।

ভাব ও রস (Sentiments)

আখ্যানবস্তু ও চরিত্রের বর্ণনা দ্বারাই মহাকাব্যোচিত ভাব ও রসের বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাকাব্যের ভাবরাশি স্বাভাবিক আবেগপূর্ণ এবং গৌরবোদ্দীপক হওয়া আবশ্যক, স্বাভাবিকতা এবং গৌরব দুইই যুগপৎ প্রকাশিত না হইলে মহাকাব্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। এইজন্য উপযুক্ত প্রতিবেশ সৃষ্টি করা আবশ্যক, অতি সাধারণ ও অতি পরিচিত এবং অসম্ভব ও অনভিজ্ঞাত, এই উভয়ই মহাকাব্যের পক্ষে অনুপযোগী।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বলেন, মহাকাব্যে শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত এই তিনটির একটি রস প্রধান, এবং অন্য সমুদয় রস অঙ্গস্বরূপ হইবে। কেবলমাত্র সামরিক ব্যাপার ও বীরোচিত ভাবই মহাকাব্যের বর্ণনীয় হইবে, এই কথা পাশ্চাত্যগণও সকলে স্বীকার করেননা।

রস ও ভাববর্ণনায় অনৌচিত্য দোষই মুখ্য দোষ। অনেক কাব্যেই রস, ভাব ও পাত্র সম্পর্কে অনুচিত বিষয়ের অবতারণা দেখা

যায়। ইহাতে কাব্যের গৌরব, গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদার লাঘব হইয়া থাকে।

ভাষা (Language)

মহাকাব্যে ভাব-গৌরবের ন্যায় ভাষা-গৌরবেরও সমান প্রয়োজনীয়তা আছে। ধ্বনি ও অলঙ্কারের দিক হইতে ভাবের সমুচিত প্রকাশ-ভঙ্গী চাই। কাব্যজগতে মহাকাব্য হিমালয়ের তুল্য, তাহার বিশালতা ও সমুন্নতি-পরিজ্ঞাপক বপুই ভাষাগৌরব।

মহাকাব্যের ভাষার প্রধান গুণ প্রসাদ ও ওজোগুণ, চিত্তের প্রসন্নতা ও দীপ্তি উভয়ই সম্পাদন করা আবশ্যক। যে সমুদয় শব্দ ও বাক্যে স্বাভাবিকতা, স্বচ্ছতা ও গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান, তাহাই মহাকাব্যের উপযোগী। এইজন্য কবিগণ সমাজে সাধারণ কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত ও ইতর লোকের প্রযুক্ত শব্দাবলী বর্জ্জন করেন। কবিগণ ভাষার সৌষ্ঠবময় শক্তিশালী শব্দগুলি চয়ন করিয়া, অনেক সময়ে আবার ইচ্ছামত শব্দরাশি সৃষ্টি করিয়া ভাষার পুষ্টি সাধন করেন। প্রাচীন ভাষার শব্দ প্রয়োগেও অনেক সময়ে মহাকাব্যের গৌরব বর্দ্ধিত হয়। ইহা ব্যতীত অনুপ্রাস, উপমা, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি অর্থান্তরন্যাস, উল্লেখ, স্বভাবোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কাররাশি মহাকাব্যের মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া থাকে। হোমর কর্ত্তৃক প্রযুক্ত একজাতীয় উপমা এপিক-উপমা বা হোমরীয় উপমা নাম লাভ করিয়াছে।

মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য্য ও ওজস্বিতা রক্ষা করিবার জন্য মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালা মহাকাব্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের বাহন বাঙ্গালা পয়ার ছন্দ, তাহাও মহাকাব্য রচনায় চিরকাল প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য, এই

উভয় ছন্দই নিজ বৈশিষ্ট্যগুণে মহাকাব্যের ভাব ও ভাষা সম্যক্ ধারণ করিতে সমর্থ। এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষাংশে দ্রষ্টব্য।

পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকগণ অনেকে Epicকে 'Epic of growth' এবং 'Epic of Art' এই দুই জাতিতে বিভক্ত করিয়া দেখিয়াছেন। নিপুণ সমালোচক এবারক্রম্বি (Lascelles Abercrombie) দেখাইয়াছেন, এপিকের মূল লক্ষণবিচারে এই দুই জাতি স্বীকারের কোন সার্থকতা নাই। উভয় জাতীয় এপিকই দেশবাসিগণের মনে সত্য বলিয়া বদ্ধমূল কোন ঘটনা অবলম্বনে রচিত হয়; এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষদের উপলক্ষ্য করিয়া কবি তৎকালীন রাষ্ট্র, সমাজ বা ধর্ম্মের ক্ষেত্রে বহুমুখী ব্যাপক জীবনের বর্ত্তমান ব্যর্থতা ও সমৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতের পরিশুদ্ধ আদর্শ ও গৌরবময় পরিণতি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পান। এপিক্ কাব্যে কবি স্বীয়কালের সিদ্ধি ও ভাবীকালের আদর্শ উভয়ে আলোকপাত করিয়া মানব জীবনের মূল্য নির্দ্ধারণ করেন।

এই কথা সকলদেশের সকল মহাকাব্য সম্বন্ধেই খাটে।

বিষয়নিষ্ঠ কাব্যের মধ্যে রোমান্স কাব্য বা Metrical Romance একটি বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়া আছে। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান,' নবীন সেনের 'রঙ্গমতী' এই শ্রেণীর কাব্য বলা যাইতে পারে।

নাট্যকাব্য বা Dramatic Poetryও বিষয়-নিষ্ঠ কাব্য। ইহা নাটকাকারে লিখিত হইলেও অভিনয়ের জন্য অভিপ্রেত নহে, প্রকৃত নাটকোচিত লক্ষণ ও গুণরাশিও ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়না, ইহার রসাস্বাদন পাঠ হইতেই জন্মিয়া থাকে। ইহারও নানা ভেদ আছে। 'গান্ধারীর আবেদন,' 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' 'নরকবাস' প্রভৃতি এই শ্রেণীর

কবিতা। 'গান্ধারীর আবেদন' আখ্যানবস্তু, চরিত্র, রস, ভাব ও ভাষা বিচারে এপিক বা মহাকাব্য ; তবে ইহা অখণ্ড নয়, খণ্ড। মহাকাব্যের একদেশানুসারী বলিয়া ইহাকে **খণ্ডকাব্য** বলা যাইতে পারে।

গীতিকবিতা (Lyric)

গীতিকবিতা পরবর্ত্তী মানব সভ্যতার সৃষ্টি। সভ্যতার প্রথম যুগে মানবচিত্ত বহির্জগতের বিস্ময়কর ব্যাপার, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং সমাজ-জীবনের ঘটনা দেখিয়া অভিভূত হইয়াছে, তাহারই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় গাথাকাব্যে, মঙ্গলকাব্যে ও মহাকাব্যে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার পরিণত অবস্থায় মানুষ অন্তর্জগতের সন্ধান পাইয়াছে, সেখানে কত 'বাসনার সোনা' জ্বলিতেছে, কত আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভয়, উদ্বেগ নিত্য স্পন্দিত হইতেছে। গীতিকবিতা বা লিরিক মানব-সভ্যতার এই পরিণত যুগের সাহিত্য। ইহা মহাকাব্যের বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত, ইহা বহির্ম্মুখী নহে—অন্তর্মুখী, ঘটনা-প্রধান নহে—ভাব-প্রধান, বিষয়নিষ্ঠ নহে—আত্মনিষ্ঠ, বৃহদাকার নহে—ক্ষুদ্রাবয়ব, মহিমাময় নহে—ব্যঞ্জনাময় ও সুন্দর, প্রশস্ত ও ব্যাপক নহে—সংহত ঘনীভূত ও গভীর, নৈর্ব্যক্তিক নহে—ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, ক্লাসিক্যাল নহে—রোমাণ্টিক, বাঁধা রীতিতে তাহার প্রকাশ নহে—স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মে তাহা সমুজ্জ্বল, ছন্দের ক্ষেত্রেও বাঁধা পয়ারই তাহার শ্রেষ্ঠ বাহন নহে—অসংখ্য ভঙ্গীতে তাহার কথা ও সুরের নব নব অভিব্যক্তি। গীতিকাব্য কবিকেই গৌরবান্বিত করে, ইহাতে বিষয়বস্তুর আলম্বনে কবিচিত্তেরই বিচিত্র প্রকাশ ঘটে। ইহা মুখ্যতঃ তাই কবিনিষ্ঠ অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ (subjective), কবিমন এখানে স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল হইয়া নিজ বৈশিষ্ট্যে বিষয়বস্তুর ঊর্দ্ধে বিরাজমান থাকে, বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া

আপনার নব নব রূপ অভিব্যক্ত করে। ইহাই আত্মনিষ্ঠতা বা subjectivity.

ইহাই অনেক সময়ে সৌন্দর্য্য-বিস্ময়-বিমিশ্র রমণীয় রোমান্টিক সাহিত্য ; সংস্কৃতে যাহাকে অদ্ভুত রস কহে, তাহাতেই ইহার উৎকর্ষ। ইহাতে সুদূর ও অজ্ঞাত আদর্শের সন্ধান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই সাহিত্যে রোমান্টিসিজম্ (Romanticism), যাহার লক্ষণ "adding strangeness to beauty"। কবিরা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার আদর্শ স্বীকার করিয়া যাহা কিছু সুন্দর মনোরম ও বিস্ময়াবহ, আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া আপন চিত্তের আলোক দিয়া তাহাকেই রূপায়িত করেন। এই আলোক সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ভাব-রসিক কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেন,—

"The light that never was on land or sea,
The consecration and the poet's dream."

ইহাই কবির মনের রঙ্গে বিষয়ের অনুরঞ্জন। অধিকাংশ গীতিকবিতার ইহা একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম।

পাশ্চাত্য লিরিক শব্দের একটি ইতিহাস আছে, Lyre অর্থাৎ বীণা-সংযোগে গীত হইত বলিয়া ইহার এই নামকরণ হয়। বর্ত্তমানে অবশ্য সুর বা ছন্দোবদ্ধভাবই ইহার প্রাণ। বাঙ্গালা 'গীতিকবিতা' ইংরাজী Lyric শব্দের অনুবাদ মাত্র। সংস্কৃতে এই জাতীয় কাব্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আলঙ্কারিকদের বিশ্লেষণে ধরা পড়ে নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে গীতধর্ম্মী গাথা পাওয়া যায় মাত্র, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তাহা বিষয়নিষ্ঠ। বিশুদ্ধ গীতিকবিতাও পাওয়া যায়, অনেক পুরুষ ও মহিলা কবির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা অনেকাংশে গীতিকবিতার

লক্ষণাক্রান্ত। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রে গীতিকবিতার কোন পৃথক বিভাগ নাই, সুতরাং আলঙ্কারিকগণ এগুলিকে কোন বিশেষ নামে চিহ্নিত করিয়া দেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্য আলোচনায় বলিয়াছেন, "গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাব-ব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল, অনেক গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল। ...অতএব গীতের যে যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটনামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।"

গীতিকাব্যের প্রধান ধর্ম্ম ঋজুতা বা অকপটতা (sincerety), কবির ভাবাবেগ যাহার জন্য প্রকাশিত হইয়া পাঠকের ভাবোদ্রেক করিতে সমর্থ হয়। যে জাতীয় ভাবের উদ্রেক হয়, তদনুযায়ী কেহ কেহ গীতিকাব্যকে মূলতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন, যথা—(১) সরল (simple) (২) উচ্ছ্বাসময় (enthusiastic), (৩) চিন্তাপূর্ণ (Reflective)। ভালবাসা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশেই 'সরল' গীতিকবিতার সার্থকতা।

একটি কথা এখানে উল্লেখ করা উচিত, গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তিত্ব প্রধান হইলেও, বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতারাজির অধিকাংশই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অসাধারণ ভাব অপেক্ষা মানব-সাধারণ ভাবকে অর্থাৎ 'ব্যক্তি' (Individual) অপেক্ষা 'জাতি' (type) কে রূপ দিয়াছে।

শিক্ষার্থীদিগের বোধসৌকর্য্যার্থ পাশ্চাত্যপ্রথানুযায়ী গীতিকবিতার

নিম্নলিখিত শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে রসানুযায়ী বিভাগই শ্রেষ্ঠ বিভাগ। বৈষ্ণব গীতিকবিতা আস্বাদন ও বিশ্লেষণের পথ আবার একটু বিচিত্র প্রকারের, এখানে বাহুল্য ভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না।

১। ভক্তিমূলক গীতিকবিতা (Devotional Lyric) ভক্তি-ভাব কিংবা ধর্ম্মভাব আশ্রয় করিয়া এই জাতীয় কবিতায় রস প্রকাশিত হয়। রামপ্রসাদী গান (যথা—"মা মা বলে আর ডাকব না"), শান্ত ও দাস্য রসাশ্রিত বৈষ্ণব পদাবলী (যথা—'তাঁতল সৈকতে বারি-বিন্দু সম'), রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম্ম সঙ্গীত' বা 'গীতাঞ্জলির' গান (যথা—'আমার মাথা নত করে দাও হে' ইত্যাদি) প্রভৃতি এই জাতীয় গীতি-কবিতা। নিম্নে দুইটি কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল।

বঁধু কি আর বলিব আমি
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণ নাথ হইও তুমি!

তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসী ;
আমি সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।

ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে ;—
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই—
দাঁড়াব কাহার কাছে ?

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায় ?
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায় ।

—চণ্ডীদাস

এমন দিন কি হবে মা তারা !
যবে 'তারা, তারা তারা', ব'লে
তারা বেয়ে পড়্‌বে ধারা !
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌ব লুটে, তারা ব'লে হব সারা !
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্যবেদ তারা আমার নিরাকারা !
শ্রীরাম প্রসাদ রটে—মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আঁখি মেলে দেখ মাকে, তিমিরে তিমিরহরা !

—রাম প্রসাদ সেন

২। প্রেমমূলক গীতিকবিতা (Love Lyric)

রতিভাবকে অবলম্বন করিয়া এই জাতীয় করিতায় রস প্রকাশিত হয়। ইহাকে মুখ্যতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—প্রথম,—সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত বৈষ্ণব পদাবলী যাহাতে ধর্ম্মভাব ও প্রেম-ভাব মিশ্রিত রহিয়াছে। দ্বিতীয়,—লৌকিক জগতে ভালবাসার পরিচায়ক গীতিকবিতা, বাহা ধর্ম্মসাধনার অঙ্গীভূত নহে। মধুর রসাশ্রিত গীতিকবিতা—ইহার অনেক উপবিভাগ আছে, যথা—পূর্ব্বরাগ,

রসোল্লাস, অভিসার, মান, মিলন, বিরহ, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি। আবার নায়িকার অবস্থাবিচারে অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা প্রভৃতি।

পৃথিবীর সমুদয় সাহিত্যেই প্রেমমূলক গীতিকবিতার প্রাধান্য, বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাহার অভাব নাই। "সখি কেবা শুনাইল শ্যামনাম' হইতে "সখি কি পুছসি অনুভব মোয়' প্রভৃতি বৈষ্ণব পদাবলী এবং রবীন্দ্রনাথের 'প্রেমের অভিষেক', 'অনন্ত প্রেম', 'অবিনয়' সকলই উজ্জ্বল আদিরসাশ্রিত গীতিকবিতা। নিম্নে তিনটি সম্পূর্ণ কবিতা উদ্ধৃত হইল।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই, কি আর বলিব।
যে পণ করেছি মনে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার।
লহু লহু হাসে পঁহু পিরীতের সার॥
গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখী-সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানা কানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাই আগুনি॥

—জ্ঞানদাস

ভালো বাসিবে ব'লে ভালো বাসিনে।
আমার স্বভাব এই—তোমা বই আর জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি
দেখিলে সুখেতে ভাসি,
সেজন্য দেখিতে আসি,
দেখা দিতে আসিনে।

—শ্রীধর কথক

আঁখির মিলন

আঁখির মিলন ওযে, আঁখির মিলন ওযে,
আঁখির মিলন!
ভুলিলরে ধূলি-খেলা, ভুলিল সঙ্গীর মেলা,
বাহু পসারিয়া করে আত্ম সমর্পণ।
আঁখি যুগ বিস্ফারিয়া, হাসিরাশি ছড়াইয়া,
জননীর কমকণ্ঠ করিয়া ধারণ!
নাচে সিন্ধু শশি করে, টানে রবি ধরণীরে,
যাদুরে করিল যাদু জননী-বদন!
ওই আঁখির মিলন!

আঁখির মিলন ওযে আঁখির মিলন ওযে,
আঁখির মিলন !

লোকে না বুঝিল কিছু, লোকে না জানিল কিছু,
দম্পতীর হ'ল তবু শত আলাপন !
হ'ল মন জানাজানি, হ'ল প্রাণ টানাটানি,
আশার চিকণ হাসি, মানের রোদন,
বিজয়ার কোলাকুলি, আঁধারে শ্যামার বুলি,
প্রেমের বিরহ-ক্ষতে চন্দন লেপন—
ওই আঁখির মিলন !

আঁখির মিলন ওযে আঁখির মিলন ওযে,
আঁখির মিলন !
পাখী, শাখী, তরঙ্গিণী, করে সুমধুর ধ্বনি,
"আয় ক্ষ্যাপা, ধেয়ে আয়, পাবি দরশন !"
ফেল্ ফেল্ করি চায়, ভেবে নাহি ঠিক পায়,
কোন্ দিকে ? হায় ওযে সকলি মোহন !
প্রকৃতির সাথে হয় কবি-চিত্ত বিনিময়
সংসার বোঝেনা সেই জীবন্ত স্বপন—
ওই আঁখির মিলন !

—দেবেন্দ্র নাথ সেন

এই কবিতার প্রথমাংশে বাৎসল্যরস।

৩। দেশপ্রীতিমূলক গীতিকবিতা (Patriotic Lyric)—এই জাতীয় কবিতার স্থায়ীভাব দেশপ্রীতি, যে প্রীতি বা প্রেম কেবলমাত্র

জন্মভূমির উপর অর্পিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত, হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত', রবীন্দ্রনাথের 'ভারতলক্ষ্মী', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ভারতবর্ষ' সকলই দেশপ্রীতি-মূলক গীতিকবিতা। নিম্নে দুইটি সম্পূর্ণ কবিতা উদ্ধৃত হইল।

আশার স্বপন

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা,
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।
এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে,
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন কি মোহন বলে,
ঘুমায়ে ক্ষনেক পড়িনু হেথা।
আমি শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে
পুণ্য দেব স্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা গোদাবরী নর্ম্মদা কাবেরী—
পঞ্চনদ কূলে একই প্রথা।
আর দেখিনু যতেক ভারত সন্তান,
একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান্,
আসিছে যেনগো তেজে মূর্ত্তিমান্
অতীত সুদিনে আসিত যথা।

ঘরে ভারত রমণী সাজাইছে ডালি,
বীর শিশু কুল দেয় করতালি,
মিলি' যত বালা গাঁথি' জয়-মালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয়-গাথা !

—কামিনী রায়

বঙ্গ জননী

কে মা তুই বাঘের পিঠে ব'সে আছিস্ বিরস-মুখে ?
শিরে তোর নাগের ছাতা, কমল-মালা ঘুমায় বুকে !
ঢল ঢল্ নয়ন-যুগল জল-ভ'রে প'ড়ছে ঢুলে,
কাল মেঘ মিলিয়ে গেল তোর ঐ নিবিড় কাল চুলে,
শিথিল মুঠি, ত্রিশূল কেন ধরার ধূলা আছে চুমি,
কে মা তুই কে মা শ্যামা,—তুই কি মোদের বঙ্গ ভূমি ?
মা তোর ক্ষেতের ধান্য রাশি জাহাজ ভ'রে যায় বিদেশে
অন্ন-সুধা বঙ্গে ফেরে গরল হ'য়ে সর্ব্বনেশে,
বনের কাপাস বনে মিলায়, আমরা দেখি চেয়ে, চেয়ে,
অন্ন বসন বিহনে হায়, মরে তোমার ছেলে মেয়ে !
বল্ মা শ্যামা, শুধাই তোরে, মোদের এ ঘুম ভাঙ্‌বে নাকি ?
ধন্য হ'তে পার্‌বনা মা তোমার মুখের হাসি দেখি' ?
ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি',
ভয় ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার তেমনি হাসি !
চরণ তলে সপ্তকোটি সন্তানে তোর মাগেরে—
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দেগো, রাগিয়ে দে তোর নাগেরে ;
সোনার কাঠি, রূপার কাঠি,—ছুঁইয়ে আবার দাওগো তুমি,
গৌর বিনীমূর্ত্তি ধর—শ্যামাঙ্গিনী—বঙ্গভূমি !

—সত্যেন্দ্র দত্ত

৪। নিসর্গ কবিতা (Lyric of Nature)—

ইহারও নানা শ্রেণীভেদ আছে, কোনটিতে নিসর্গের বাহিরের রূপ, কোনটিতে তাহার প্রাণের রূপ পরিস্ফুট হয়; ইহা ছাড়া এই শ্রেণীর চিন্তাপূর্ণ (reflective) কবিতাও আছে। নিসর্গের রূপানুযায়ী ইহাতে ভাব ও রসের বিচিত্র ভেদ হইয়া থাকে।

বিহারীলালের 'হিমালয়', রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষা' ('হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে' । 'চঞ্চলা' তিন শ্রেণীর উদাহরণ। নিম্নে দুইটি কবিতা উদ্ধৃত হইল।

সুখ

আজি মেঘ মুক্ত দিন, প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো, সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে। ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্দ্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে। ভাঙা উচ্চ তীর,
ঘনচ্ছায়া পূর্ণ তরু, প্রচ্ছন্ন কুটীর,
বক্র শীর্ণ পথ খানি দূর গ্রাম হতে
শস্য ক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষ্ণার্ত্ত জিহ্বার মতো। গ্রাম-বধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠ-মগন

করিছে কৌতুকালাপ। উচ্চ মিষ্ট হাসি
জল কল স্বরে মিশি পশিতেছে আসি
কর্ণে মোর। বসি এক বাঁধা নৌকা'পরি
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি,
রৌদ্রে পিঠ দিয়া। উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্যে, ধৈর্য্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহজ্বালাতন।
তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার,
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্ম্মল বিস্তার,
মধ্যাহ্ন-আলোক প্লাবে জলে স্থলে বনে
বিচিত্র বর্ণের রেখা। আতপ্ত পবনে
তীর-উপবন হতে কভু আসে বহি'
আম্রমুকুলের গন্ধ, কভু রহি রহি
বিহঙ্গের শ্রান্ত স্বর।

* * *

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্ধ্যারাণী

দূরে—সুমেরুর শিরে আসে সন্ধ্যারাণী,
সুনীল বসনে ঢাকি' ফুল তনু খানি।
তরল গুণ্ঠন—আড়ে
মুখ-শশী উঁকি মারে,

সম্ভ্রমে উছলি পড়ে কত প্রেম-বাণী।
নব নীলোৎপল মত
আঁখি দুটি অবনত,
সম্ভ্রমে সঙ্কোচে কত বাঁধিছে চরণ।
পতির পবিত্র ঘরে
সতী পরবেশ করে—
হাতে সুবর্ণের দীপ, হৃদয়ে কম্পন।
আসে ধনী আখি বথি,
কপালে তারকা-সীঁথি,
সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু—দীনাস্ত-তপন ;
গুচ্ছে গুচ্ছে কালো চুলে
স্তব্ধ অন্ধকার দুলে,
দিগন্ত—বসনাঞ্চলে কত না রতন।
ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে—
পুলিনে, তুলসী তলে,
যেন শত চক্ষু মেলে হেরিছে ধরণী।
মন্দিরে মঙ্গলারতি,
বালা পূজে সন্ধ্যা সতী,
পুরনারী ভক্তিভরে করে শঙ্খ-ধ্বনি। —অক্ষয় বড়াল

•

৫। শোকমূলক গীতিকাবিতা (Lyric of Grief) :—ইহা প্রধানতঃ করুণরসাশ্রিত। অক্ষয় কুমার বড়ালের পত্নীবিয়োগে রচিত 'এষা' কাব্য এবং চিত্তরঞ্জন প্রয়াণে নজরুল কবি লিখিত 'চিত্তনামা' কাব্য ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নিম্নে দুইটি কবিতা উদ্ধৃত হইল।

মধুসূদনের মহাপ্রয়াণে

"হা অদৃষ্ট !—কবিবর ! এই কি তোমার
ছিলহে কপালে ?
মধুস্থদনের, হায় ! (শুনে বুক ফেটে যায়,
এই পরিণাম বিধি লিখেছিল ভালে ?

দিয়াছিল সেই রত্ন ভারতী তোমায়
অপার্থিব ধন,
রাজ্য বিনিময়ে আহা, কেহ নাহি পায় তাহা,
দাতব্য চিকিৎসালয়ে তোমার মরণ ?

কিংবা কণ্টকিত হায় ! যে বিধি করিল
গোলাপ কমল ;
সে বিধি পাষাণমনে দহিতে স্থকবিগণে
কবিত্ব-অমৃতে দিল দারিদ্র্য-অনল ।

বহু যুদ্ধে না পারিয়া করিতে নির্ব্বাণ
এই হুতাশন ;
প্রাণ-পত্নী করে ধরি নরলীলা পরিহরি
পশিলে, মধুস্থদন, অমর জীবন ।

কৃতঘ্ন মা বঙ্গভূমি ! এতদিন তব
কবিত্ব-কানন,
যেই পিকবর কল উছলে যমুনা জল
উছলিত ব্রজে শ্যাম-বাঁশরী যেমন ;—

সে মধু সথারে আজি, পাষাণ পরাণে
(কি বলিব হায় !)
অযত্ন মা অনাদরে বঙ্গ কবি কুলেশ্বরে
ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, দিয়াছ বিদায় ?

মধু কোকিল-কণ্ঠে— অমৃত লহরী—
কে আর এখন,
দেশ দেশান্তরে থাকি কে 'শ্যামা জন্মদে' ডাকি
নূতন নূতন তানে মোহিবে শ্রবণ ?

তোমার মানস খনি করিয়া বিদার,
কাল দুরাচার,
হরিল যে রত্ন, হায় ? কতদিনে পুনরায়
ফলিবে এমন রত্ন ? ফলিবে কি আর ?

শূন্য হ'ল আজি বঙ্গ কবি-সিংহাসন !
মুদিল নয়ন
বঙ্গের অনন্য কবি কল্পনা-সরোজ রবি
বঙ্গের কবিতা-মধু হরিল শমন।

* * *

—নবীনচন্দ্র সেন

ইন্দ্র পতন

তখনো অস্ত যায়নি সূর্য্য, সহসা হইল সুরু
অম্বরে ঘন ডম্বরু ধ্বনি গুরু গুরু গুরু গুরু !

আকাশে অকাশে বাজিছে এ কোন্ ইন্দ্রের আগমনী ?
শুনি, অম্বুদ-কম্বু-নিনাদে ঘন বৃংহিত-ধ্বনি।
বাজে চিক্কুর-হ্রেষা—হর্ষণ মেঘ-মন্দুরা মাঝে,
সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলয়ঙ্কর সাজে !

ঘনায় অশ্রু-বাষ্প-কুহেলি-ঈশান-দিগঙ্গনে
স্তব্ধ বেদনা দিগ্-বালিকারা কি যেন কাঁদনী শোনে !
কাঁদিছে ধরার তরুলতা পাতা, কাঁদিতেছে পশু পাখী,
ধরার ইন্দ্র স্বর্গে চলেছে ধূলির মহিমা মাখি !
বাজে আনন্দ-মৃদং গগনে, তড়িত কুমারী নাচে,
মর্ত্ত্য-ইন্দ্র বসিবে গো আজ স্বর্গ ইন্দ্র কাছে !
সপ্ত আকাশ-সপ্তস্বরা হানে ঘন করতালি,
কাঁদিছে ধরায় তাহারি প্রতিধ্বনি—খালি, সব খালি !

হায় অসহায় সর্ব্বংসহা মৌনা ধরণী মাতা,
শুধু দেব-পূজা তরে কি মা তোর পুষ্প হরিৎ-পাতা ?
তোর বুকে কি মা চির-অতৃপ্ত রবে সন্তান ক্ষুধা !
তোমার মাটির পাত্রে কিগো মা ধরেনা অমৃত-সুরা ?
জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে কেহ আনিবে অমৃত বারি
অমৃত—অধিপ দেবতার রোষ পড়িবে কি শিরে তারি?
হয়ত তাহাই, হয়ত নহেতো, এটুকু জেনেছি খাঁটি,
তারে স্বর্গের আছে প্রয়োজন যারে ভালোবাসে মাটি !

কাঁটার মৃণালে উঠেছিল ফুটে যে চিত্ত-শতদল,
শোভেছিল যাহে বাণী কমলার রক্ত চরণ-তল,

সম্ভ্রমে-নত পূজারী মৃত্যু ছিঁড়িল সে শতদলে—
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অর্পিবে বলি' নারায়ণ পদতলে !
জানি জানি মোরা, শঙ্খ-চক্র-গদা যাঁর হাতে শোভে
পায়ের পদ্ম হাতে উঠে তাঁর অমর হইয়া রবে !
কত সান্ত্বনা আশা মরীচিকা কত বিশ্বাস দিশা
শোক-সাহারায় দেখা দেয় আসি, মেটেনা প্রাণের তৃষা !

* * *

(চিত্তনামা)—কাজি নজরুল ইসলাম

৬। সামাজিক বা আমোদ প্রমোদমূলক গীতিকবিতা (Convival Lyric) ঃ– এই জাতীয় কবিতা প্রধানতঃ হাস্যরসাশ্রিত, অনেক সময়ে তীব্র বিদ্রূপে পরিণত হয়। কবি ঈশ্বর গুপ্তের 'পাঁটা' বা রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার' 'হিং টিং ছট' কবিতা এই শ্রেণীর। নিম্নে দুইটি সম্পূর্ণ কবিতা উদ্ধৃত হইল।

বিধবা বিবাহ

বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল ॥
কত বাদী প্রতিবাদী করে কত রব।
ছেলে বুড়ো আদি করি মাতিয়াছে সব ॥
কেহ উঠে শাখাপরে কেহ থাকে মূলে।
করিছে প্রমাণ জড়ো পাঁজি পুঁথি খুলে ॥
এক দলে যত বুড়ো আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হয়ে মাতে সব দেখেনাকো গোড়া ॥

লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে কত ।
দুই দলে খাপাখাপি ছাপাছাপি কত ॥
বচন রচন করি কত কথা বলে ।
ধর্ম্মের বিচার পথে কেহ নাহি চলে ॥
"পরাশর" প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ ।
কেহ বলে এ যে দেখি সাগরের ঢেউ ॥
কোথা বা করিছে লোক শুধু হেউ হেউ ।
কোথা বা বাঘের পিছে লাগিয়াছে ফেউ ॥
অনেকেই এই মত লতেছে বিধান ।
"অক্ষত যোনির" বটে বিবাহ বিধান ॥
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে ।
একেবারে ত'রে যাক যত রাঁড়ী আছে ॥
কেহ কহে এই বিধি কেমনে হইবে ?
হিঁদুর ঘরের রাঁড়ী সিঁদুর পরিবে !
বুকে ছেলে কাঁকে ছেলে ছেলে ঝোলে কোলে
তার বিয়ে বিধি নয় উলু উলু বোলে ॥
গিলে গিলে ভাত খায় দাঁত নাই মুখে ।
হইয়াছে আঁত খালি হাত চাপা বুকে ॥
ঘাটে যারে নিয়ে যাব' চড়াইয়া খাটে ।
শাড়ী পরা চুড়ি হাতে তারে নাকি খাটে ?
শুনিয়া বিয়ের নাম "কনে" সেজে বুড়ী ।
কেমনে বলিবে মুখে "খুড়ী খুড়ী খুড়ী" ॥
পোড়া মুখ পোড়াইয়া কোন পোড়ামুখি ।
'দুখি', 'সুখি' মেয়ে ফেলে কেঁচে হবে খুকি ॥

বেটা আছে যার তার বেলগাছ এঁচে।
ছুড়ী মেরে থুড়ী ব'লে সে বসিবে কেঁচে ?
গমনের আয়োজন শমনের ঘরে।
বিবাহের সাধ সেকি মনে আর করে ?
যেথানে সেথানে শুনি এই কলরব।
বালার বিবাহ দিতে রাজী আছে সব ॥
সকলেই এই রূপে বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে ॥
শরীর পড়েছে ঝুলে চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাঁখা ?
জ্ঞান হারা হয়ে যাই নাহি পাই ধ্যানে।
কে পাড়িবে 'সৎ বাবা' মায়ের কল্যাণে!

—ঈশ্বর গুপ্ত

প্রাণান্ত

প্রাণ রাখিতে সদাই প্রাণান্ত ;
জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জান্‌ত।
ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট, তার পরেতে যে সব কষ্ট,
বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত।
স্নানাদির পর নিত্য নিত্য ক্ষুধায় জ্ব'লে যায় পিত্ত ;
খেতে বস্‌লে চর্ব্বণ কর্ত্তে কর্ত্তে পরিশ্রান্ত ;
যদিইবা খাই যথাসাধ্য, খেলেই যায় ফুরায়ে খাদ্য ;
পান্ত আন্‌তে লবণ ফুরায়, লবণ আন্তে পান্ত।

দিনে গা গড়াবামাত্র, বসে মাছি সর্ব্ব গাত্র,—
রাত্রে মশার ব্যবহারও অভদ্র নিতান্ত ;
তদুপরি ভার্য্যার অর্দ্ধরজনীতে গয়নার ফর্দ্দ,—
নাসিকা ডাকা পর্য্যন্ত নাহি হ'ন ক্ষান্ত !
কিনিলেই কোনও দ্রব্য, দাম চাহে যত অসভ্য ;
রাস্তা জুড়ে বোসে আছে পাওনাদার দুর্দ্দান্ত।
বিয়ে কল্লেই পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা,
পড়া'তে আর বিয়ে দিতে হই সর্ব্বস্বান্ত।

—দ্বিজেন্দ্র লাল রায়

৭। চিন্তামূলক কবিতা (Purely Reflective Lyric) : —ইহা নানা রসাশ্রিত হইতে পারে, অনেক সময়েই ইহাতে রস অপেক্ষা চিন্তার প্রাধান্য হয় বেশি। হেমচন্দ্রের 'পদ্মের মৃণাল', বা নবীনচন্দ্রের সায়ংচিন্তা, চিন্তামূলক গীতিকবিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নিম্নে একটি কবিতা উদ্ধৃত হইল।

জাতির পাঁতি

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথী,
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচা গুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।

দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙ্গা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারি সমান রাঙা,
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে যে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে,
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।
যুগে যুগে মরি কত নির্ম্মোক
আমরা সবাই এসেছি ছাড়ি'
জড়তার জাড়ে থেকেছি অসাড়ে
উঠেছি আবার অঙ্গ ঝাড়ি;
উঠেছি চলেছি দলে দলে ফের
যে মোরা হ'তে জানিনে আলা,
চলেছি গো দূর দুর্গম পথে
রচিয়া মনের পান্থশালা;
ফুল-দেবতার-গৃহ-দেবতার
গ্রাম-দেবতার বাহিয়া সিঁড়ি
জগৎ-সবিতা বিশ্ব পিতার
চরণে পরাণ যেতেছে ভিড়ি'

জগৎ হয়েছে হস্তামলক
জীবন তাহারে ধরেছে মুঠে
অভেদের ভেদ উঠেছে ধ্বনিয়া ;—
মানস-আভাস জাগিয়া উঠে ;
সেই আভাসের পুণ্য আলোকে
আমরা সবাই নয়ন মাজি,
সেই অমৃতের ধারা পান করি,
অজ্ঞেয় শকতি মোদের আজি ।

* * *

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৮। নীতিকবিতা (Didactic Poetry) :—ইহাকে গীতিকবিতা না বলাই সঙ্গত। ভাবের আবেগ ও রসের স্পর্শ না থাকিলে কেবলমাত্র ছন্দোবদ্ধ বলিয়া শব্দরাশি কবিতা হইতে পারে না। ইহার উদ্দেশ্য আনন্দদান নহে, শিক্ষাদান। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'রোগপ্রতীকার', ঈশ্বরগুপ্তের 'বাক্য অপেক্ষা কার্য্য ভাল' প্রভৃতি নিছক নীতিকবিতা। এই জাতীয় একটি উৎকৃষ্ট কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মানব দেহের নশ্বরতা

জাননা কি নর ! অস্থির পঞ্জর,
তব এই কলেবর
প্রফুল্ল অন্তরে, তাহে বাস করে,
প্রাণ পক্ষী নিরন্তর

ত্যজিয়া পিঞ্জর সে বিহঙ্গবর,
উড়ে গেলে একবার ;
জেন এই সার পিঞ্জর মাঝার,
পশিবেনা পুনর্ব্বার ।
কি নিশ্চয় তার, কত দিন আর
রহিবে পঞ্জর-কায় ?
উড়িবে যখন, নারিবে তখন,
নয়নে হেরিতে তায় ।
আছে যতক্ষণ, ধরহ বচন,
সময় সার্থক কর ;
সাবধান হও কখন না রও,
ভবিষ্যতে করি ভর ।
করিব বলিয়া রহিলে বসিয়া,
করা কভু নাহি হয়
করণীয় যাহা, আশু কর তাহা
বিলম্ব উচিত নয় ।

—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

৯। নানাবিষয়িণী গীতিকবিতা (Miscellaneous) :—অনেক উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা রহিয়াছে, যাহা স্পষ্টরূপে উক্ত শ্রেণীভেদের অন্তর্গত হয় না।

স্বল্প পরিসর স্থান বলিয়া কাব্যের অন্যান্য ক্ষুদ্রভেদ আলোচনা করা সম্ভবপর হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অলঙ্কার ও রূপোল্লাস

কাব্যশাস্ত্র-বিচারে অলঙ্কার শব্দটি সুচিন্তিত প্রয়োগ কিনা বিবেচ্য। অনেকে মনে করিতে পারেন—যেখানে আলঙ্কারিকগণ বলেন, "কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরং, রসাদিশ্চাত্মা, গুণাঃ শৌর্য্যাদয় ইব, দোষাঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়োঽবয়ব-সংস্থান-বিশেষবৎ, অলঙ্কারাশ্চ কটককুণ্ডলাদিবৎ, (সাহিত্য-দর্পণ-ধৃত বচন), অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ কাব্যের শরীর, রসাদি আত্মা, গুণ শৌর্য্যাদির ন্যায়, দোষ কাণত্বাদির ন্যায়, অলঙ্কার কটককুণ্ডলাদির ন্যায়, সেখানে অলঙ্কার একেবারেই বাহিরের আভরণ হইয়া দাঁড়ায়। সুন্দরীর অঙ্গ হইতে তাহার অলঙ্কাররাশি উন্মোচনের ন্যায় কাব্যশরীর হইতেও তাহার অলঙ্কাররাশি উন্মোচন করিয়া লইলে যেন কাব্যের কাব্যত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না, বাহিরের শোভা কমিয়া যায় মাত্র! নিকৃষ্ট কাব্য সম্বন্ধে হয়তো একথা খাটে, উৎকৃষ্ট কাব্য সম্বন্ধেও নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথম আলোচনায় একথা হয়তো সত্য, কিন্তু ইহা কখনই অলঙ্কারের স্বরূপ প্রকাশ নহে। অলঙ্কারের পরম ও চরম সার্থকতা কাব্যের বাহিরের শোভাবর্দ্ধনে নহে, কাব্যে রসের রূপদানে। শ্রেষ্ঠ কাব্যের বাচ্য ও অলঙ্কারে কোন প্রভেদ নাই, কবির রসপ্রকাশের ভাষা অর্থাৎ ভাবের রূপের মাঝারে অঙ্গলাভই কাব্যের অলঙ্কার। এই অলঙ্কার খসাইয়া লওয়া যায় না, তাহা হইলে কাব্যের রূপই অন্তর্হিত হয়। অলঙ্কার কাব্যের শোভা-বর্দ্ধক মাত্র নহে, অলঙ্কারই কাব্যের ভাষা এবং বাচ্য।

রসশব্দ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে সহৃদয় সামাজিক-বেদ্য অর্থাৎ পাঠকগত

বলিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু রস মূলতঃ কবিগত, তাই কবির সম্বন্ধেই সর্ব্বাগ্রে প্রযোক্তব্য। ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের অভিনবগুপ্ত-রচিত অভিনব-ভারতী-ভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে, "......এবং মূল-বীজ-স্থানীয়াৎ কবিগতো রসঃ। কবির্হি সামাজিকতুল্য এব।......ততো বৃক্ষস্থানীয়ং কাব্যম্।" (৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৪২ সূত্রের টীকা) কবিগতরস কাব্যের বীজস্থানীয়, কাব্য বৃক্ষস্থানীয়। বীজ নিজেকে পরিস্ফূর্ত্ত করিবার আবেগে শাখা-পল্লব-পুষ্প-ফল সমন্বিত বৃক্ষের সৃষ্টি করে, রসও নিজেকে মূর্ত্ত করিবার আবেগে বাচ্য-রীতি-ছন্দ-অলঙ্কার সৃষ্টি করে। তাই অলঙ্কার প্রভৃতি রসের বহিরঙ্গ নয়, অন্তরঙ্গ।

ধ্বন্যালোকে অলঙ্কারের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেখা যায়,—

"রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ননির্ব্বর্ত্ত্যঃ সোঽলংকারো ধ্বনৌ মতঃ॥"

—ধ্বন্যালোক, ২।১৭

এখানে অলঙ্কারের দুইটি লক্ষণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, প্রথম রসাক্ষিপ্ততা, দ্বিতীয় অপৃগগযত্ন-সম্পাদ্যতা। অলঙ্কার রস দ্বারা আক্ষিপ্ত অর্থাৎ আকৃষ্ট হয়, রসের রূপে পরিণতির পথে অলঙ্কার স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়। এই জন্য শ্রেষ্ঠ কাব্যে বাচ্য ও অলঙ্কার ভিন্ন বস্তু হয় না, রূপকাদি অলঙ্কারই কাব্যের বাচ্যস্বরূপ হইয়া রসকে রূপে পরিণত করে। দ্বিতীয় লক্ষণ হইতে দেখা যায়, কাব্যের রসবস্তু ও অলঙ্কার মহাকবির অপৃথগ্ যত্ন অর্থাৎ একপ্রযত্ন দ্বারাই সিদ্ধ হয়, রসানুভূতি ও অলঙ্কারাশ্রয়ে রূপোল্লাস একই কালে সম্পন্ন হয়। এই সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষী ক্রোচের মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য। ক্রোচে প্রসিদ্ধ Asthetics

গ্রন্থে 'Intuition and Expression' নামক প্রথম অধ্যায়ে বলিতেছেন,—

"Every true intuition is also expression. That which does not objectify itself in expression is not intuition or representation,......"

প্রত্যেকটি খাঁটি উপলব্ধিই অভিব্যক্তি। রূপে যাহার অভিব্যক্তি হয় নাই, তাহার উপলব্ধিও হয় নাই। কবির বেলায় ভাবের অনুভূতি ও শব্দে প্রকাশ একেবারে অভিন্ন। এই শব্দাশ্রয়েই সাক্ষাৎভাবে অলঙ্কার আসিয়া থাকে, নতুবা অনুভূতি রূপ না হইয়া তত্ত্বের আকার গ্রহণ করে। অতঃপর 'Expression and Rhetoric' নামক উক্ত গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে ক্রোচে বলিতেছেন,—

"One can ask oneself how an ornament can be joined to expression. Externally? In that case it must always remain separate. Internally? In that case, either it does not assist expression and mars it; Or it does form part of it and is not ornament, but a constituent element of expression, indistinguishable from the whole."

ইহার উপর পৃথক্ টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। অলঙ্কার বাহির হইতে প্রযুক্ত হইলে বাচ্য হইতে পৃথক্ থাকিবে। ভিতর হইতে প্রযুক্ত হইলে হয় অভিব্যক্তির বাধা ঘটাইবে, নতুবা বাচ্যের অঙ্গস্বরূপ হইয়া সমগ্র হইতে অভিন্নরূপে প্রকাশ পাইবে। সেক্ষেত্রে তাহাকে অলঙ্কার বলা চলে কি? ইহাকেই ধ্বন্যালোক গ্রন্থে 'অপৃথগ্‌যত্ন-নির্ব্বর্ত্ত্য' বলিয়া বলা হইয়াছে।

বস্তুতঃ দার্শনিক যেখানে সীমাকে অসীমের ভিতর দিয়া বস্তুকে তত্ত্বে পরিণত করেন, কবি সেখানে অসীমকে সীমাবন্ধনে আনিয়া তত্ত্বকে রূপের মধ্যে মুক্তি দান করেন। রবীন্দ্রকাব্য হইতে এই উক্তির অসংখ্য উদাহরণ মিলিবে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় ভাবের এই রূপোল্লাস স্পষ্টতররূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ও পরিণত বয়সের রচনা 'চঞ্চলা' এই দুইটি কবিতা পরীক্ষা করা যাউক। 'নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ' কবিতা পড়িলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে, কবি আত্ম-শক্তির জাগরণের কথা, বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া দুর্দ্দম বেগে অগ্রসর হওয়ার কথা, জগতে আত্মদানের সঙ্গে আত্মপ্রসারের কথা এবং সীমার সৌন্দর্য্যময় লীলার মধ্য দিয়া অসীমে সার্থকতা-বরণের কথা বলিতেছেন। কবি কিন্তু সাক্ষাৎভাবে কোথাও এই হিতকথা বা তত্ত্বকথা আলোচনা করেন নাই। তাঁহার মনে এই তত্ত্বটি নির্ঝরের সুপ্তিভঙ্গ, পর্ব্বত প্রাচীর লঙ্ঘন, জগৎ প্লাবন এবং বিচিত্র লীলালাস্যের সহিত সমুদ্রযাত্রার রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রসাস্বাদনের সমকালেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ-রূপ বাচ্যে তাহা রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তত্ত্ব এইপ্রকার রূপ গ্রহণ না করিলে ইহা কাব্য না হইয়া দর্শন হইত। তত্ত্ব-বস্তুর এই যে রূপোল্লাস, ইহাই কাব্যের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার; এই অলঙ্কারকে কটককুণ্ডলাদির ন্যায় বাচ্য হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না, ইহা রসের অন্তরঙ্গ। আলঙ্কারিকদের ভাষায় ইহা হয়তো অপ্রস্তুত প্রশংসা, অপ্রস্তাবিত বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ের প্রকাশ। বাস্তবিক পক্ষে এখানে 'বিশেষ' (particular) বিষয় বর্ণনাদ্বারা 'সামান্য' (general) অর্থের প্রকাশ হইয়াছে। দর্শনের কার্য্য 'সামান্য' লইয়া, কাব্যের রূপোল্লাস 'বিশেষে'র সাহায্যে।

'চঞ্চলা' কবিতাটিতেও কবি অপরূপ ভঙ্গী সহকারে একটি 'বিশেষ'

অর্থ প্রবাহিণী নদী দ্বারা একটি 'সামান্য' অর্থ দুর্ণিবার উদ্দামবেগে জীবনের নিরুদ্দেশ যাত্রা রূপায়িত করিয়াছেন। এখানেও তত্ত্ববস্তু রসে পরিণত হইয়া কাব্য হইয়াছে কেবলমাত্র রূপাবলম্বনে। এই রূপোল্লাসই কাব্যের আসল অলঙ্কার, এখানেও তাহা সিদ্ধ হইয়াছে অপ্রস্তুত প্রশংসার সাহায্যে।

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটিতে একই রূপোল্লাস দেখিতে পাওয়া যায় অন্য ভঙ্গীতে। প্রস্তাবিত সমুদ্রে অপ্রস্তাবিত জননীর ব্যবহার আরোপ করিয়া সমাসোক্তি অলঙ্কারের সাহায্যে অর্থবস্তু কাব্যরূপে উল্লসিত হইয়াছে

প্রসিদ্ধ 'শা-জাহান' কবিতাটিতে শা-জাহানের স্থান কোথায়? কাব্যের রূপরাশির অন্তরালে তত্ত্ববস্তু প্রত্যক্ষ করিলে বুঝা যাইবে, শা-জাহান একটি 'বিশেষ' অর্থ, দৃষ্টান্ত মাত্র; মহারাজ শা-জাহানকে উপলক্ষ্য করিয়া মহামানবের উদ্দেশ্যে মহাকবি বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন,

"মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে।
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে,
তাই এ ধরারে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মত যাও ফেলে॥

তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারম্বার।"

এখানে তত্ত্ববস্তুটিকে রূপায়িত করিবার জন্য শা-জাহান আবশ্যক হইয়াছে। 'বিশেষ' দ্বারা 'সামান্যে'র সমর্থনে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার এখানে উজ্জ্বল হইয়াছে। উক্ত কাব্যেই 'জীবনের খরস্রোত' বুঝাইবার জন্য 'দক্ষিণের মন্ত্র গুঞ্জরণে' 'বসন্তের মাধবীমঞ্জরী' হইতে আরম্ভ করিয়া 'হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি' পর্য্যন্ত ভাবের আর একটি আশ্চর্য্য রূপোল্লাস পাওয়া যায়। এই রূপোল্লাসই কাব্যের প্রকৃতিগত অলঙ্কার।

রবীন্দ্রনাথের 'নববর্ষা' কবিতাটিতে ('হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে') কবি-মনে নববর্ষার ভাব বিশ্বের কত বিচিত্র রূপের মধ্য দিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। এই কবিতার অর্থবস্তু বা বাচ্য আর অলঙ্কার কি কোথাও পৃথক্ করা চলে ? পৃথক্ নাম থাক্ বা নাই থাক, রূপোল্লাসই কাব্যের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ; ইহা রস-গত, কারণ কবির অনুভূত রস ইহাকে আকৃষ্ট করে, এবং ইহা 'অপৃথগ্‌যত্ন-নির্ব্বর্ত্ত্য' কবির রসাস্বাদনের সমকালেই ইহা স্ফূর্ত্ত হয়। পাঠকের দিক্ হইতে এই অলঙ্কারই রসকে আকর্ষণ করে, এবং ইহার আস্বাদনেই পাঠকের অন্তরে রস স্ফূর্ত্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথের রচনা স্বভাবতঃই অলঙ্কার-বহুল, কিন্তু একটি অলঙ্কারও কষ্টার্জ্জিত বা নিষ্প্রাণ নয়, তাহা বিহঙ্গ কণ্ঠের কাকলির ন্যায়, গিরি-নির্ঝরের প্রবাহের ন্যায় সর্ব্বত্রই অন্তরাবেগে স্ফূর্ত্ত হইয়া স্বকীয় দ্যুতিতে ভাবকে রূপায়িত করিয়া রসে পরিণত করিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োগ অনেক জটিলও বটে।

সমগ্র কাব্যের ন্যায় কাব্যের খণ্ড বা অংশেও একইরূপে অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখা যাইবে।

শব্দের দুইটি রূপ,—ধ্বনি (sound) এবং অর্থ (sense)। ধ্বনির

আশ্রয়ে শব্দালঙ্কার এবং অর্থের আশ্রয়ে অর্থালঙ্কার। বিভিন্ন শব্দের মধ্যে ধ্বনি-সাম্যে অনুপ্রাস অলঙ্কারের সৃষ্টি, ইহাই শ্রেষ্ঠ শব্দালঙ্কার; বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে অর্থ-সাম্যে উপমা অলঙ্কারের সৃষ্টি, ইহাই শ্রেষ্ঠ অর্থালঙ্কার। যেখানে শব্দগত ধ্বনিসাম্য ঝঙ্কার দ্বারা মূল অর্থকে পরিব্যক্ত করে, সেখানেই অনুপ্রাসের সার্থকতা। এই অনুপ্রাস কবির রূপসৃষ্টির পথে স্বয়ং স্ফূর্ত্ত না হইলেই বাক্যের ভার হইয়া রসকে আচ্ছন্ন করে। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট কবির পার্থক্য এইখানে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে লিখিয়াছেন,

"দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
　　　　তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী মঞ্জরী
　　　　যেইক্ষণে দেয় ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায় গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্ন দল।"

—শা-জাহান

সেখানে 'ঞ্জ' ও 'ঞ্চ' এবং 'ন', 'ম', 'ল' ধ্বনির আবৃত্তিতে এক অপূর্ব্ব মোহ আসে, মোহ হঠাৎ আঘাত পায় 'ধূ' ধ্বনির আবৃত্তিতে এবং ভাঙ্গিয়া যায় 'ছ' ধ্বনির আবৃত্তিতে ও যুক্তবর্ণ 'ন্ন' এর আঘাতে। এখানে ধ্বনি আশ্চর্য্যরূপে ভাবকে রূপ দিয়াছে। এইখানেই অলঙ্কারের সার্থকতা। শব্দালঙ্কারও ভূষণমাত্র নয়, ধ্বনি দিয়া সে রসকে আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে উক্ত স্তবকের শেষ চরণের দীর্ঘপর্ব্ব ও দীর্ঘমাত্রা লক্ষণীয়। ইহাই কাব্যে সঙ্গীতধর্ম্মিতা। শ্লেষ বা যমকের এই শক্তি

নাই, তাহাতে কেবল বুদ্ধির চাতুর্য্য, এই জন্য তাহারা নিকৃষ্ট শব্দালঙ্কার; বর্ত্তমান সাহিত্যে তাহাদের প্রয়োগ প্রায় লুপ্ত।

একইরূপে উপমার উপযোগিতাও বুঝা যায়। ভাবকে বস্তুর আশ্রয়ে রূপ দিতে গিয়া সৃষ্টির অনুরূপ বস্তু সমাহৃত হয়, তাহাই উপমান। উপমানের রূপ ও গুণের মধ্য দিয়াই উপমেয় রসে পরিণত হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যে বসন্তের বরে অনিন্দ্য সুন্দরী চিত্রাঙ্গদা যেখানে সরোবরজলে আপনার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, অর্জ্জুনের মুখ হইতে একটি উপমায় সেই স্থলের বর্ণনা শোনা যাউক,—

"সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে,
শ্বেত শতদল যেন কোরক বয়স
যাপিল নয়ন মুদি',—যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবর জলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে।"

—চিত্রাঙ্গদা

এখানে উপমানই কি বাচ্যকে প্রকাশ করিয়া রস আকর্ষণ করে নাই? অথচ কত সহজ স্বাভাবিক এই উপমাটি!

উক্ত কাব্য হইতে আর একটি উপমা লওয়া যাউক্, স্বল্পাক্ষর হইলেও দেখা যাইবে তাহার শক্তি কত বেশি। চিত্রাঙ্গদা যখন রূপমুগ্ধ অর্জ্জুনকে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, তিনি

তখন বিহ্বল হইয়া তিন পংক্তির একটি উপমায় আপনার অবস্থা ব্যক্ত করিলেন,—

"তুমি ভাঙ্গিয়াছ ব্রত মোর।
চন্দ্র উঠি' যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার।"

এখানে সমগ্র অর্থ ও 'ধ্বনি' (suggestion) কি কেবল ঐ উপমাটি হইতেই আসিতেছে না? উপমা-ব্যতিরিক্ত আর যে কথা এখানে আছে, উত্তম কাব্যে তাহার কোনও মূল্য নাই। এই উপমার সহিত শক্তিতে তুলিত হইতে পারে কেবলমাত্র মহাকবি কালিদাসের একটি উপমা। কুমারসম্ভব কাব্যে উমামুখ-দর্শনে 'কিঞ্চিৎ-পরিলুপ্ত-ধৈর্য্য' হরকে চিত্রিত করিবার জন্য তিনি লিখিয়াছেন,—

'চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।'

—কত ক্ষুদ্র, কিন্তু কত সুন্দর ঐ চন্দ্র, নামেরই অর্থ আহ্লাদকর! আকাশে তাহার উদয় হইতে না হইতেই অকূল ও অতল জলনিধি উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে, কিন্তু কদাচ বেলা অতিক্রম করে না। অকাল বসন্তের পুষ্প-সম্ভারে সজ্জিতা উমাকে দেখিয়া হরও সেইরূপ ক্ষণতরে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

এখানেও সমগ্র বাচ্যই উপমার রূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রেষ্ঠ উপমা সম্বন্ধে সর্ব্বত্র ঐ একই কথা, কবির 'অপৃথগ্‌যত্ন' দ্বারা সম্পন্ন হওয়া চাই, না হইলে উপমা কবির বুদ্ধি-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়া রসকে আচ্ছন্ন করিবে।

উপমার ক্রম-পরিণতি উৎপ্রেক্ষা, রূপক ও অতিশয়োক্তিতে;

প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত ইহার ভেদ, অপ্রস্তুতপ্রশংসা ও সমাসোক্তির মূলেও ইহা বর্ত্তমান। অবশ্য এইরূপ আরও কয়েকটি অলঙ্কার আছে। ইহারাই শ্রেষ্ঠ অর্থালঙ্কার।

এই সমুদয় অলঙ্কারের বিবরণ কাব্যনির্ণয় গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছন্দ

শব্দ ও বাক্য উভয়ই গতিলক্ষণাক্রান্ত প্রবাহাত্মক। গতির ভিতরে যেখানে ছেদ বা স্থিতি আসে, সেখানেই খণ্ড বা অখণ্ড অর্থের প্রকাশ হয়। এই সাধারণ গতি ও স্থিতির খেলা গদ্য বাক্যেও দেখা যায়। পদ্যে অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যে রস-সঞ্চার করিবার জন্য বিশিষ্টরূপে আবেগের ধর্ম্ম সঞ্চারিত করিতে হয়। আবেগের ধর্ম্ম বেগ, তাহা গিরিনির্ঝরিণীর নৃত্যশীল প্রবাহ; বাক্যে এই বেগ-সঞ্চারই ছন্দের বন্ধন। বাক্যের স্বাভাবিক পদস্থাপনারীতি তখন ব্যাহত হয়, ব্যাকরণের বন্ধনে শিথিলতা ঘটে, নিজ ছন্দের বন্ধনই প্রবল হয়। এই বন্ধন বাহিরের বন্ধন; ইহারই ফলে যে সুর ও তালের সঞ্চার হয়, তাহা বেগবান্ অশ্বের ন্যায় সীমাবদ্ধ অর্থকে অতিক্রম করিয়া অসীম ও অনির্ব্বচনীয়

লোকের ইঙ্গিত করে। ছন্দের বন্ধনেই ভাবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং ভাবের মুক্তি। ইহারই জন্য শব্দের চয়ন, বয়ন, ধ্বনি-সন্নিবেশ এবং "বর্জ্জন, গ্রহণ সজ্জীকরণের" বিশেষ প্রণালী আবশ্যক হয়। তবুও একথা সত্য, ছন্দের স্ফূর্ত্তি ভাবানুষঙ্গে সহজরূপেই ঘটিয়া থাকে; কবিচিত্তের আবেগ স্বভাবতঃই শব্দ-নিচয়ে অনুরূপ তরঙ্গ-দোলার সঞ্চার করে।

ছন্দ

অতএব ছন্দের লক্ষণ সংক্ষেপে এইরূপে করা যাইতে পারে,—

পদ-নিচয়কে যে ভাবে বিন্যস্ত করিলে গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়া বাক্য শ্রুতিমধুর এবং রসোজ্জ্বল হয়, তাহাকে **ছন্দ** কহে।

সই! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ!

—চণ্ডীদাস।

পড়িলেই বাক্যে গতিবেগ বা তরঙ্গদোলা অনুভূত হইবে; ইহা তাই শ্রুতি-মধুর এবং চিত্তে আবেগের সঞ্চার করিয়া রসাস্বাদন জন্মায়। এখানে যদি ছন্দের বন্ধন ভাঙ্গিয়া দিয়া শব্দগুলিকে শিথিল ও ব্যাকরণ-সম্মত করিয়া লেখা হয়,—"সখি! কে আমাকে শ্যাম নাম শুনাইল? এই নাম যে কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া আমার প্রাণ আকুল করিয়া তুলিল।" তবে ইহা "বেগের আবেগ" হারাইবে, ইহাতে কোনও লোকোত্তর প্রেরণা পাওয়া যাইবে না, ইহা হইবে গদ্য।

সুলেখকগণের গদ্য রচনায়ও এক প্রকার ছন্দোলক্ষণ দৃষ্ট হয়; কিন্তু পদ্য-রচনাতেই ইহা সুপরিব্যক্ত। এখানে পদ্য ছন্দই বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

মাত্রা ও অক্ষর

পরিমিত গতি-বেগ বা উচ্চারণের নির্দ্দিষ্ট কাল-পরিমাণই বাক্যের ছন্দোবন্ধনের মূল কথা। একই ছন্দের কবিতায় বিভিন্ন স্তবকের উচ্চারণে এবং একই স্তবকে নির্দ্দিষ্ট পংক্তি-নিচয়ের উচ্চারণে তুল্য-পরিমাণ কালের প্রয়োজন। উচ্চারণের এই কাল-পরিমাণকে **মাত্রা** বলা হয়। মাত্রার হিসাব করিয়া ছন্দের শ্রেণী-বিভাগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনযুক্ত স্বরবর্ণ হ্রস্ব উচ্চারিত হইলে একমাত্রা এবং দীর্ঘ উচ্চারিত হইলে দুইমাত্রা বলিয়া গণ্য হয়। ব্যঞ্জনান্ত স্বর শব্দের অন্তেস্থিত হইলে দুইমাত্রা বলিয়া গণ্য হয়। তৎসম শব্দের দীর্ঘস্বর এবং সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্বস্বর সহজেই দীর্ঘ উচ্চারিত হইয়া দুইমাত্রা হইতে পারে।

মাত্রা বা উচ্চারণের কালপরিমাণ শব্দের যে স্বল্পতম ধ্বনি আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার নাম **অক্ষর** বা Syllable। বাক্যের উপাদান যেমন শব্দ, শব্দের উপাদান তেমনই অক্ষর, বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে ইহা উচ্চারিত হয়। প্রত্যেক অক্ষরে একটি করিয়া স্বরবর্ণ থাকিবেই, স্বরের উচ্চারণের সহিত তৎ-পূর্ব্বে বা পরে একটি বা অধিক ব্যঞ্জনবর্ণও থাকিতে পারে। অক্ষর তাই দুই প্রকার,—স্বর বা স্বরান্ত এবং ব্যঞ্জনান্ত।

পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতায় 'কে', 'বা', 'শু', 'না', 'ই', 'ল', 'শ্যা', 'ম', 'নাম্‌ এক একটি অক্ষর; 'ই' স্বর অক্ষর, 'নাম্‌' ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর এবং 'কে', 'বা',

'শু', 'না', 'ল', 'শ্যা', 'ম' প্রত্যেকটি স্বরান্ত অক্ষর। হ্রস্ব উচ্চারণ বলিয়া প্রত্যেকটি অক্ষর এক মাত্রার, কেবলমাত্র 'নাম্' শব্দ ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বলিয়া দুই মাত্রার। পংক্তিটিতে মোট ১০টি মাত্রা আছে।

ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।

—রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'গৌ', 'যৌ, 'ষা' 'শ্যা', 'গ', 'সা' দীর্ঘ উচ্চারিত বলিয়া দুই মাত্রার, কিন্তু এক একটি অক্ষর মাত্র। 'গ' সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং এখানে দীর্ঘ-উচ্চারিত, তাই দুই মাত্রার হইল।

হাত্, প্রাণ্টা, পারাবার্, পারাবারের্ প্রভৃতি বাঙ্গালা উচ্চারণানুসারে এক, দুই, তিন এবং চারিটি করিয়া অক্ষর আছে; কিন্তু মাত্রা আছে, দুই, তিন, চারি ও পাঁচটি করিয়া। অক্ষর ও মাত্রা সকল সময়ে তাই একার্থবাচক হয় না। বাঙ্গালায় হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর সাধারণতঃ একই রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু ছন্দের অনুরোধে দীর্ঘস্বর, এমন কি হ্রস্ব স্বরও কখন কখন দীর্ঘরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। শব্দের অন্তেস্থিত বলিয়া ব্যঞ্জনান্ত স্বর কবিতায় প্রায়ই দীর্ঘ গণ্য হয়।

অক্ষরের এই সংজ্ঞা সংস্কৃতের সংজ্ঞানুযায়ী এবং ইংরাজী syllable এর অনুরূপ। বাঙ্গলায় চলিতমতে অক্ষর বলিতে লিখিত বর্ণ বুঝায়, এই ধারণা ত্যাগ করিতে হইবে। মাত্রার সংজ্ঞাও প্রধানতঃ সংস্কৃতের সংজ্ঞানুরূপ। বাঙ্গালায়ও কখন কখন তিন মাত্রার অক্ষর হয়।

স্বরাঘাত (Accent, stress)

ছন্দের গতিবেগ কেবলমাত্র মাত্রা বা স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের

কালপরিমাণের উপর নির্ভর করে না, স্বরের গাম্ভীর্য্য বা উচ্চারণের জোরের উপরও অনেকটা নির্ভর করিয়া থাকে।

স্বরবর্ণের উচ্চারণে গাম্ভীর্য্যবৃদ্ধি, জোর বা আঘাতের নাম **স্বরাঘাত**।

বাঙ্গালায় শব্দোচ্চারণে প্রতিশব্দের আদিস্বরের গাম্ভীর্য্য স্বভাবতঃ অধিক হয়, অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দে আদি অক্ষরে স্বরাঘাত পড়ে; যেমন ম´ানুষ, হ´াত, ম´রণ, অ´নন্ত, বৃ´দ্ধ, ভ´য়ঙ্করী, স´াহেব ইত্যাদি। '´' চিহ্ন-দ্বারা স্বরাঘাত প্রদর্শিত হইল। পরবর্ত্তী অক্ষরগুলিতে গাম্ভীর্য্য ক্রমশঃ কমিতে থাকে।

বাঙ্গালায় বাক্যোচ্চারণে প্রতি বাক্যখণ্ড বা পদ-সমষ্টির (Phrase এর) প্রথম শব্দের আদ্য অক্ষরে স্বরাঘাত পড়ে, পরবর্ত্তী শব্দগুলিতে গাম্ভীর্য্য ক্রমশঃ কমিতে থাকে, পরবর্ত্তী বাক্যখণ্ডে আদ্য অক্ষরে গাম্ভীর্য্য আবার বাড়িয়া যায়। উদাহরণ,—

"ভ´াল,। স´ভাপণ্ডিত মহাশয়!। এ´কটা কথা। জি´জ্ঞাসা করি,। অ´াপনি এতদুক্তি। কো´ন্ শাস্ত্রে। দে´খিয়াছেন?॥"

—মৃণালিনী, বঙ্কিমচন্দ্র

এ´ক পারে উদয়গিরি,। অ´পর পারে ললিতগিরি,। ম´ধ্যে স্বচ্ছসলিলা। ক´ল্লোলিনী বিরূপা নদী। নী´ল বারিরাশি লইয়া। স´মুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে।॥

—সীতারাম, বঙ্কিমচন্দ্র

কবিতায় স্বরাঘাত আরও স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়; যথা,—

হে´ বঙ্গ,। ভ´াণ্ডারে তব। বি´বিধ রতন।॥
ত´া সবে। (অ´বোধ আমি!)। অ´বহেলা করি,।

—বঙ্গভাষা, মধুসূদন

অথবা,

হাঁত ঘুরুলে। নাঁড়ু দেব,। নৈঁলে নাড়ু। কোঁথা পাব। ॥
ডাঁলিম গাছে। ফিঁল্‌পু নাচে। তাঁক্‌ ধিনাধিন। বাঁদ্যি বাজে। ॥

শেষের উদাহরণটিতে যে স্বরাঘাত দেখা যায়, তাহা প্রবল **স্বরাঘাত**; তাহার ফলে বাক্যখণ্ডস্থ সমুদয় স্বর কার্য্যতঃ হ্রস্ব-রূপে পরিগণিত হয়।

ছেদ

গদ্য বা পদ্য বাক্যমাত্রই গতিলক্ষণাক্রান্ত ধ্বনিপ্রবাহ বিশেষ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই গতির ভিতরে যেখানে ছেদ বা স্থিতি আসে, সেখানেই ধ্বনিবৈচিত্র্য জন্মে এবং খণ্ড বা অখণ্ড অর্থ প্রকাশ পায়। গতির ছেদের সহিত তাই অর্থ-প্রকাশের সম্পর্ক। তাই আমরা যখন বাঙ্গালায় কোন গদ্য বা পদ্য বাক্য পড়ি, এই স্বাভাবিক গতিচ্ছেদ বা অর্থের প্রকাশধারা লক্ষ্য করিয়া পড়িয়া থাকি। বাস্তবিক বাঙ্গালা বাক্যে প্রত্যেকটি পদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে উচ্চারিত হয় না, অর্থের খণ্ড খণ্ড ছেদানুযায়ী বাক্য স্বভাবতঃ কতিপয় পদসমষ্টি (Phrase) অর্থাৎ **বাক্য-খণ্ডে** বিভক্ত হয়। বাক্য মধ্যস্থ প্রত্যেকটি খণ্ড অর্থবাচক শব্দ সমষ্টিতে পূর্ণ থাকে। এইরূপে একটি বাক্য অর্থবাচক নানাখণ্ডে সম্পূর্ণ হয়। যেখানে অর্থের সম্পূর্ণতা ঘটে ও বাক্য সমাপ্ত হয়, সেখানে ছেদ কিছু দীর্ঘ হয়; ইহাকে বলে **পূর্ণ-চ্ছেদ**। বাক্যের মধ্যে যেখানে অর্থবাচক একটি বাক্যখণ্ড শেষ হয়, সেখানে অল্পচ্ছেদ হয়, ইহাকে বলা যাইতে পারে **অর্দ্ধচ্ছেদ**। বাঙ্গালা বাক্যের এই খণ্ডগুলি সাধারণতঃ অর্থ-বিভাগ (sense-group) এবং শ্বাস-বিভাগ (breath-group) উভয়ই এককালে অনুসরণ করিয়া থাকে। কারণ,

অর্থবাচক প্রতি খণ্ডের পরে বাগ্‌যন্ত্রের বিশ্রাম ঘটে। একটি খণ্ড এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত ধ্বনির সমষ্টি।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই বাক্যখণ্ডের প্রথম শব্দের আদ্যস্বরে স্বরাঘাত পড়ে। ঐ সম্পর্কে উদাহৃত গদ্য ও পদ্য বাক্য কয়টির ছেদ-বিভাগ দ্রষ্টব্য। গদ্য বাক্যে কি প্রকারে ছন্দস্পন্দন (rhythm) আসে, তাহাও উক্ত ছেদ-বিভাগ দ্বারা অনুমিত হইবে। প্রথম গদ্য বাক্যটি কথোপকথনের ভাষার উদাহরণ; তাহার ছন্দ লঘু। দ্বিতীয় গদ্য বাক্যটি পরিশুদ্ধ ও সমুন্নত রচনা; তাহার ছন্দ গুরু। গদ্য-ছন্দও এইভাবে অর্থের প্রতিধ্বনি করিয়া থাকে। কিন্তু গদ্যছন্দের পর্ব্বগুলির ন্যায় ওজনে ঠিক সমান হয় না। কারণ, পদ্যচ্ছন্দে ছেদবিভাগ ছাড়াও যতি-বিভাগ নামে অপর এক বিভাগ আছে। গদ্যচ্ছন্দের খণ্ডগুলি অসমান হওয়ায় ধ্বনির অল্পাধিক বৈচিত্র্য সৃষ্ট হইয়া একঘেয়েমি নষ্ট হইয়া থাকে। পদ্যচ্ছন্দে যেখানে এই ছেদ ও যতি সাধারণতঃ ভিন্ন হয়, সেখানেই (যথা অমিত্রাক্ষর ছন্দে) এইরূপ বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট গদ্যচ্ছন্দে ধ্বনির আরোহ, অবরোহ ও সামঞ্জস্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বাক্যের পূর্ণচ্ছেদস্থলে দাঁড়ি পড়ে, কিন্তু সমুদয় অর্দ্ধচ্ছেদস্থলে কমা, সেমিকোলন পড়ে না। পূর্ব্বে উল্লিখিত গদ্য ও পদ্য বাক্য কয়টির বিশ্লেষণেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

যতি ও পর্ব্ব

সাধারণতঃ বলা চলে গদ্যে যাহা ছেদ, পদ্যে তাহা যতি; গদ্যে যাহা অর্দ্ধচ্ছেদ, পদ্যে তাহা অর্দ্ধ যতি; এবং গদ্যে যাহা বাক্যখণ্ড, পদ্যে তাহা পর্ব্ব। গদ্যের ছেদ ও অর্দ্ধচ্ছেদ অর্থবিভাগানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হয়, অবশ্য গদ্যের rhythm বা ছন্দস্পন্দনও এই বিভাগানুযায়ী ব্যক্ত হইয়া থাকে;

এই জন্য ছেদ বা অর্দ্ধচ্ছেদ ঠিক নিয়মিত ভাবে পড়ে না, তাহার প্রয়োগে স্বাধীনতা থাকে অনেকখানি। এই স্বাধীনতাই গদ্যছন্দে বিশিষ্ট প্রাণ সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু পদ্যে যতি পরিমিত কালান্তরে কোন আদর্শানুযায়ী সুনির্দ্দিষ্টস্থলে পড়িবেই। এই যতির জন্যই পদ্য গদ্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, তাহার মিত্রাক্ষর বা মিলটি অন্ত্যানুপ্রাস অলঙ্কার মাত্র। বাক্যখণ্ড ও পর্ব্বের ভিতরেও অনুরূপ পার্থক্য লক্ষণীয়। অর্থবাচক ছেদ অনিয়মিত বলিয়া গদ্যের বাক্যখণ্ড অসমান ; পদ্যের যতি নিয়মিত বলিয়া যতি-সূচক পর্ব্ব সর্ব্বদাই সমান অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী প্রণালীবদ্ধ। পদ্যের যতি মূলতঃ শ্বাসবিভাগও নহে, কারণ বাগ্‌যন্ত্রের বিশ্রামের জন্যই যে নিয়মিত যতি দেওয়া হয়, একথা ঠিক নহে ; তাহা হইলে সকল ছন্দেই একরূপ যতি পাওয়া যাইত। পদ্যের যতি ছন্দের বিশিষ্ট ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে ; এই যতির অবস্থান হইতেই বাঙ্গালা ছন্দের বৈশিষ্ট্য বোধ ও একরূপ ছন্দের ঐক্যবোধ জন্মে। অতএব ছন্দের গতিবেগ-নিয়ামক নিঃশ্বাসের বিরামস্থলকে **যতি** বলা যাইতে পারে।

কবিতা পড়িবার সময়ে এক এক প্রকার ছন্দে এক এক প্রকার ঝোঁকে একবারে কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করিবার পর বাগ্‌যন্ত্রের বিরামের আবশ্যকতা ঘটে, বিরামের পর আবার এক ঝোঁকে কতিপয় অক্ষর উচ্চারণ করা হয়। কবিতা পাঠের এই বিরামস্থলকে যতি বলা হয়। অল্প বিরামস্থলে **অর্দ্ধযতি**, পূর্ণ বিরামস্থলে **পূর্ণ যতি** বা **যতি** পড়ে।

প্রাচীন বা আধুনিক অধিকাংশ বাঙ্গালা কবিতায় পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি এবং অর্দ্ধচ্ছেদ ও অর্দ্ধযতি অবিকল একই স্থলে পড়ে। এইজন্য কবিতায় ছেদ ও যতির পার্থক্য সহজে উপলব্ধি হয় না।

ছেদ ও যতির ঐক্যসূচক কবিতার এই কৃত্রিম শাসনের বিরুদ্ধেই মধুসূদন বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছেদ ও যতিকে পৃথক্ রাখিয়া ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ মিত্রাক্ষর ছন্দেও ছেদ-প্রয়োগের এই স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন।

যখন ছেদ ও যতি ভিন্ন হয়, তখন ছেদ-স্থলে শ্বাসের বিরাম ঘটে; যতিস্থলে শ্বাসের বিরাম হয় না, জিহ্বার ক্রিয়ার বিরাম ঘটে; যতির পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর দীর্ঘটানে উচ্চারিত হইয়া ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত রাখে। এরূপ স্থলে যতির স্বভাব অনেকটা সংস্কৃত ছন্দের যতির ন্যায়, একটা দীর্ঘটান বা তানধারা পূর্ব্বাপর পর্ব্ব সংযোজিত করে।

নিম্ন উদাহরণ দুইটিতে ছেদ ও যতি একসঙ্গে পড়িয়াছে,—

(১) মহাভারতের কথা *। অমৃত সমান * * ॥
কাশীরাম দাস কহে *। শুনে পুণ্যবান্ * * ॥

—কাশীরাম দাস

'।' ও '॥' চিহ্নদ্বারা অর্দ্ধ ও পূর্ণচ্ছেদ এবং '*' ও '* *' চিহ্নদ্বারা অর্দ্ধ ও পূর্ণ যতি নির্দ্দেশ করা হইল।

(২) অঘ্রাণে শীতের রাতে *। নিষ্ঠুর শিশিরাঘাতে *।
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া * * ॥

—রবীন্দ্রনাথ

নিম্নোক্ত উদাহরণগুলিতে ছেদ ও যতি সর্ব্বত্র একসঙ্গে পড়ে নাই,—

(৩) হে সমুদ্র,। চিরকাল * কী তোমার ভাষা * * ॥
সমুদ্র কহিল,। মোর * অনন্ত জিজ্ঞাসা * * ॥

—কণিকা, রবীন্দ্রনাথ

(৪)· অবারিত মাঠ * গগন ললাট *। চুমে তব পদ * ধূলি * * ॥
ছায়াসুনিবিড় * শান্তির নীড় *। ছোট ছোট
গ্রাম * গুলি * * ॥
—রবীন্দ্রনাথ

অমিত্রাক্ষর ছন্দের আলোচনায় এই বিষয় আরও স্পষ্ট হইবে।

পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ

ছন্দের যতিবিভাগ ও পর্ব্ববিভাগ একই প্রকারে হইয়া থাকে। কবিতাপাঠে বাগ্‌যন্ত্রের বা শ্বাসের বিরামস্থলকে বলে যতি, দুই বিরাম-স্থলের মধ্যবর্ত্তী বাক্যাংশকে বলে পর্ব্ব। অবশ্য আরম্ভও একটি বিরামস্থল বলিয়া গণ্য। তাহা হইলে একটি বিরামস্থলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক এক বারের ঝোঁকে উচ্চারিত বাক্যাংশই এক একটি **পর্ব্ব**। গদ্যবাক্যে যাহা ছেদসূচক বাক্যখণ্ড, পদ্যবাক্যে তাহাই যতিসূচক পর্ব্ব। বাঙ্গালাছন্দের স্বরূপ যতি-নির্দ্দেশ বা পর্ব্ব-গণনা হইতে ধরা পড়ে

কবিতা-রচনায় সমান মাপের পর্ব্ব অথবা মাত্রার ক্রমানুসারে পরিমিত মাপের পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত ২নং ও ৪নং উদাহরণে যথাক্রমে ২টি ও ৩টি সমান মাপের পর্ব্ব আছে। ছন্দের গঠনে পর্ব্বের বিচিত্র ভেদ দৃষ্ট হয়; সমানমাপের পর্ব্বের সহিত ছোট বা বড় মাপের পর্ব্বও ব্যবহৃত হয়। উক্ত ২নং ও ৪নং উদাহরণে শেষের পর্ব্ব দুইটি যথাক্রমে একটু বড় ও ছোট মাপের। ১নং ও ৩নং উদাহরণে দুইটি পর্ব্ব কিন্তু সমান মাপের।

প্রত্যেক পর্ব্ব আবার দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি। পর্ব্বাঙ্গ সাধারণতঃ একটি মূলশব্দ বা কয়েকটি মূলশব্দের সমষ্টি হয়; কিন্তু কখনও কখনও মূলশব্দ ভাঙ্গিয়াও পর্ব্ববিভাগ করিতে হয়। ১নং উদাহরণে

'কাশীরাম দাস কহে' এই পর্ব্বটিতে 'কাশীরাম' ও 'দাস কহে' এই দুইটি পর্ব্বাঙ্গ আছে। ২নং উদাহরণে যথাক্রমে প্রথম পর্ব্বে 'অঘ্রাণে' ও 'শীতের রাতে', ও দ্বিতীয় পর্ব্বে 'নিষ্ঠুর' 'শিশিরাঘাতে' এবং তৃতীয় পর্ব্বে 'পদ্মগুলি' ও 'গিয়াছে মরিয়া' এইরূপ দুইটি করিয়া পর্ব্বাঙ্গ আছে।

পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ-গঠনের ত্রুটি হইলে যতির হিসাব ভাঙ্গিয়া যায় এবং **যতিভঙ্গ দোষ** হয়। ত্রিপদী বা লাচাড়ী-ছন্দে যতিভঙ্গে বড়ই শ্রুতিকটুতা জন্মে। [*চিহ্নদ্বারা পর্ব্বাঙ্গ সূচিত হইতেছে]

মহাজ্ঞানী *মহাজন যে পথে ক*রে গমন
হয়েছেন *প্রাতঃস্মরণীয় ॥

হেমচন্দ্র

এখানে প্রথম দুই পর্ব্ব ৪+৪=৮, অথবা ৩+৩+২=৮ মাত্রার হইবে। দ্বিতীয় পর্ব্বে এই হিসাব ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় যতিভঙ্গদোষ হইয়াছে।

চাতকী আ*মি স্বজনি। শুনি জল*ধর ধ্বনি।
কেমনে ধৈরয ধরি* থাকিলো এখন ॥—মধুসূদন

অথবা—চল, সখি* শীঘ্র যাই। পাছে মা ধ*বে হারাই
মণিহারা ফণিনী কি* বাঁচে লো স্বজনি।—মধুসূদন

এই দুইস্থলে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বে যথাক্রমে যতিভঙ্গদোষ দৃষ্ট হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাঙ্গালায় পর্ব্ব, পর্ব্বাঙ্গ ও শব্দের আদিস্বরে অপেক্ষাকৃত অধিক গাম্ভীর্য্য হয়, অর্থাৎ স্বরাঘাত পড়ে।

পর্ব্বাঙ্গের আরম্ভে গাম্ভীর্য্য অধিক হইয়া পর্ব্বাঙ্গশেষে তাহা প্রায় লুপ্ত হয়; নূতন পর্ব্বাঙ্গের আরম্ভে আবার স্বরগাম্ভীর্য্য বাড়ে। এইরূপে

স্বরগাম্ভীর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধিদ্বারা এবং গতিবেগ-নিয়ামক যতিদ্বারা ছন্দের প্রাণ-স্বরূপ বিচিত্র স্পন্দন ও দোলার সঞ্চার হয়। এই বিচিত্রিত গতিবেগ দ্বারাই ছন্দ সঙ্গীত-ধর্ম্মিতায় চিত্তে ভাবের আবেগ এবং রসাস্বাদন জন্মাইয়া থাকে। ইহাই কাব্যে সঙ্গীত।

চরণ ও স্তবক

ছন্দের হিসাবে পূর্ণযতি-যুক্ত পর্ব্ব-সমষ্টির নাম **চরণ**। চরণের ভাগস্বরূপ অর্দ্ধযতিযুক্ত শব্দাবলীই **পর্ব্ব**। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল পদ। পরস্পর-সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ চরণ-পর্য্যায়ের নাম **স্তবক** বা stanza। সম-মাত্রার দুই চরণের মিত্রাক্ষর স্তবকই বাঙ্গালায় অধিক ব্যবহৃত হয়। আধুনিক যুগে ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ চরণের স্তবক দেখা যায়। চতুর্দ্দশপদী কবিতাকেও ১৪ চরণের স্তবক বলা যাইতে পারে; এখানে কিন্তু পদ অর্থ চরণ। ত্রিপদী কবিতা কিন্তু দুই চরণের কবিতা; এখানে পদ অর্থ পর্ব্ব। পদ শব্দ, বিভক্তিযুক্ত শব্দ, পর্ব্বাঙ্গ, পর্ব্ব, চরণ সকল অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কাব্যনির্ণয় গ্রন্থে ১৩০ হইতে ১৩৪ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন চরণের স্তবকের উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

মিত্রাক্ষরছন্দ

স্তবকের দুইটি নির্দ্দিষ্ট চরণের শেষ অক্ষর দুইটি মিত্র অর্থাৎ ধ্বনিসাম্য-যুক্ত হইলে তাহাকে **মিত্রাক্ষর** বলে। মিত্রাক্ষরকে সংস্কৃতে অন্ত্যানুপ্রাস এবং বাঙ্গালায় মিল বলে। মিত্রাক্ষর ধ্বনির ঝঙ্কারে মনে মাধুর্য্য ও আনন্দের সঞ্চার হয়। মিত্রাক্ষরযুক্ত ছন্দকে **মিত্রাক্ষর-ছন্দ** বলে। মধুসূদন-প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যতীত বাঙ্গালার প্রাচীন বা আধুনিক প্রায় সমুদয় ছন্দই মিত্রাক্ষর ছন্দ।

মিত্রাক্ষর ধ্বনি উৎপন্ন করিবার জন্য—(১) অন্ত্য ও উপান্ত্যস্বর এবং অন্ত্যস্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনবর্ণ এক হওয়া আবশ্যক; যথা—রাজে—বাজে, থামি—আমি, মধু—বঁধু ইত্যাদি, বাঙ্গালা ছন্দে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের ধ্বনি একই বলিয়া গৃহীত হয়।

(২) ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর হইলে, শেষ ব্যঞ্জনবর্ণ ও তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর এক হওয়া আবশ্যক; যথা—জগৎ-মহৎ, নবীন-দীন, দূর-সুর ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ছন্দের তিন বিশিষ্ট বিভাগ

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে অনেকে বাঙ্গালাছন্দকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এখানে অধ্যাপক শ্রীযুত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কৃত "বাংলা ছন্দের মূলসূত্র" নামক সুলিখিত গ্রন্থখানির প্রদত্ত বিভাগ অনুসৃত হইল। ছন্দোবিষয়ক আলোচনায় মতদ্বৈধস্থলে প্রায়শঃ আমরা শ্রীযুত অমূল্যধন বাবুর অভিমতই সুচিন্তিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

ছন্দের এই মৌলিক তিনটি বিভাগের নাম, স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ, ধ্বনি-প্রধান ছন্দ এবং তান-প্রধান ছন্দ।

স্বরাঘাত প্রধান ছন্দ

বাঙ্গালা ছন্দের প্রতিপর্ব্বের প্রথমেই একটি স্বরাঘাত পড়ে। যে ছন্দে এই স্বরাঘাত প্রবল বা প্রধান হইয়া ছন্দের বৈশিষ্ট্য দান করে, তাহাকে **স্বরাঘাত-প্রধান** ছন্দ বলা যাইতে পারে। পর্ব্বের প্রথমে প্রবল স্বরাঘাত থাকার জন্য পর্ব্ব-মধ্যস্থ সমুদয় অক্ষরই হ্রস্ব বা এক মাত্রার বলিয়া পরিগণিত হয়। কেবল মাত্র অক্ষর বা **স্বর**গণনা-দ্বারা মাত্রার হিসাব পাওয়া যায় বলিয়া এই ছন্দকে **স্বরমাত্রিক**

ছন্দও বলা হইয়া থাকে ; কেহ কেহ **স্বরবৃত্ত**ও বলিয়া থাকেন। এই ছন্দ গ্রাম্য ছড়া রচনায় ব্যবহৃত হইত বলিয়া **'ছড়ার ছন্দ'** নামেও পরিচিত। উদাহরণ ঃ—['।' চিহ্নদ্বারা অতঃপর পর্ব্ব সূচিত হইবে।

বি´ষ্টি পড়ে। টাঁ´পুর টুপুর। ন´দী এল। বা´ন্।
শি´ব ঠাকুরের। বি´য়ে হবে। তি´নটী কন্যা। দা´ন্।

এখানে চারিমাত্রার তিনটি পর্ব্ব, চতুর্থ বা শেষ পর্ব্বটি অপূর্ণ। প্রতি-পর্ব্বে দুইটি করিয়া পর্ব্বাঙ্গ, যথা—'বৃষ্টি' এবং 'পড়ে'। দ্বিতীয় পর্ব্বাঙ্গে কখন কখন একটি মৃদু স্বরাঘাত লক্ষিত হয়। ইহাই এই জাতীয় ছন্দের সাধারণ লক্ষণ, ইহাতে বৈচিত্র্য-সৃষ্টির অবকাশ বড় অল্প। কখন কখন চতুর্থ পর্ব্ব পূর্ণ থাকে, যথা,—

হা´ত ঘুরুলে। না´ড়ু দেব। নৈ´লে নাড়ু। কো´থা পাব।
ডা´লিম গাছে। ফি´লপু নাচে। তা´ক্ ধিনাধিন। বা´দ্যি বাজে।

আধুনিক কবিতায়ও এই ছন্দ ব্যবহৃত হয়, যথা,—

আ´কাশ জুড়ে। ঢ´ল নেমেছে। সূ´য্যি ঢলে। ছে
চাঁ´চর চুলে। জ´লের গুড়ি। মু´ক্তো ফলে। ছে,

—সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত

এই ছন্দে সর্ব্বত্রই এইরূপ চারিমাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হয় এবং প্রতি-চরণে চারিটি পর্ব্ব থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' কাব্যে এই ছন্দে নানা-সংখ্যক পর্ব্বের সমাবেশ করা হইয়াছে ; যথা,—

চ´ম্‌কে ওঠে। নি´জের পানে। চে´য়ে।
আ´কাশ পারের। বা´ণী তা'রে। ডা´ক দিয়ে যায়।
আ´লোর ঝরণা। বে´য়ে,

এখানে প্রথম চরণে তিন পর্ব্ব, দ্বিতীয় চরণে পাঁচ পর্ব্ব। দ্বিতীয় চরণের পূর্ব্বে অতিরিক্ত দুইটি পর্ব্ব বসাইয়া ছন্দের গতিকে ক্ষিপ্রতর করা হইয়াছে। দুইটি চরণেরই শেষ পর্ব্ব অপূর্ণ।

ভারত চন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের "হরগৌরীর কোন্দল ও শিবনিন্দা" নামক কবিতার ধ্রুপদটি (উমার কেশ চামর ছটা, তামার শলা বুড়ার জটা ইত্যাদি) এই ছন্দে রচিত।

ধ্বনি-প্রধান ছন্দ

যে ছন্দে উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনি পরিমাণই প্রধান, স্বরাঘাত দুর্ব্বল, অথবা নাই, এবং অক্ষর-ধ্বনির অতিরিক্ত কোন সুরের টান থাকেনা, তাহাকে **ধ্বনি-প্রধান ছন্দ** বলে। এই জাতীয় ছন্দে প্রত্যেকটি অক্ষর ছন্দের প্রয়োজনানুযায়ী কোথাও বা এক মাত্রায় কোথাও বা দুই মাত্রায় স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। উচ্চারণে মাত্রা-প্রয়োগের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য এই ছন্দ **মাত্রাবৃত্ত** নামেও কথিত হয়। ধ্বনি-পরিমাণ অতএব মাত্রা উভয়ই বৈশিষ্ট্য বলিয়া ইহাকে **ধ্বনি-মাত্রিক** ছন্দও বলা হইয়া থাকে। স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দে প্রত্যেকটি অক্ষরই হ্রস্ব ও এক মাত্রার বলিয়া গণ্য, অতএব অক্ষর সংখ্যা ও মাত্রা-সংখ্যা সমান। পরবর্ত্তী পয়ারাদি ছন্দেও মাত্রা-সংখ্যা অক্ষর-সংখ্যানুযায়ী না হইলেও হরফের বর্ণের সংখ্যানুযায়ী হইয়া থাকে। হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ এবং সেইজন্য এক মাত্রা বা দুই মাত্রার প্রশ্ন কেবলমাত্র মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই উঠিতে পারে, ইহাই এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য।

এই ছন্দের চরণও নির্দ্দিষ্ট মাত্রার পর্ব্বে বিভক্ত, প্রতিপর্ব্বে মাত্রাসাম্য রক্ষা করিবার জন্য ছন্দের প্রয়োজনানুযায়ী কোন স্বর দীর্ঘ, কোন স্বর হ্রস্বরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। সংস্কৃতের ন্যায় স্বরের

হ্রস্ব ও দীর্ঘরূপ উচ্চারণ ব্যতিরেকে এই ছন্দ আকৃতি দেখিয়া চেনা যায় না। উদাহরণ—

কত নগ নগরী। তীর্থ হইল তব। চুম্বি চরণ যুগ। মায়ি
কত নর নারী। ধন্য হইল মা। তব সলিলে অব। গাহি
বহিছ জননি এ। ভারতবরষে। কতশত যুগ যুগ। বাহী।

—দ্বিজেন্দ্র লাল রায়

বড় অক্ষরের চিহ্ন দীর্ঘ বা দুই মাত্রার পরিচায়ক, অবশিষ্ট অক্ষরগুলি এক মাত্রার। এখানে ৪টি পর্ব্ব, প্রথম তিন পর্ব্বে ৮ মাত্রা করিয়া, শেষ পর্ব্বে ৪ মাত্রা, প্রতিচরণে মোট ২৮ মাত্রা।

পাদপ্রান্তে। রাখ সেব। কে
শান্তি সদন। সাধন-ধন। দেবদেব। হে
সর্ব্বলোক। পরম শরণ। সকল মোহ। কলুষ-হরণ
দুঃখতাপ। বিঘ্ন তারণ। শোক-শান্ত। স্নিগ্ধ-চরণ
সত্যরূপ। প্রেমরূপ। হে!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখানে ৬ মাত্রা দ্বারা এক একটি পর্ব্ব রচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'মদন ভস্মের পূর্ব্বে', 'মদন ভস্মের পরে' প্রভৃতি কবিতাও এই ছন্দে রচিত। কাব্যনির্ণয় গ্রন্থের ১২১ ও ১২২ পৃষ্ঠায় এই ছন্দের কয়েকটি উদাহরণ রহিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই ছন্দের প্রয়োগ অনেক সময়ে দেখা যায়, যথা,—

নীরদ নয়ানে। নীরঘন সিঞ্চনে। পুলক-মুকুল-অবলম্ব
স্বেদ মরন্দ। বিন্দু বিন্দু চুয়ত। বিকশিত ভাবকদম্ব।

—গোবিন্দ দাস

এখানে প্রথম দুইটি ৮ মাত্রার পর্ব্ব, শেষেরটি ১০ মাত্রার।

বেশি মাত্রার পর্ব্ব এই ছন্দে ব্যবহার করা যায় না। সংস্কৃত, ইংরাজী বা আরবী ভাষার ছন্দের অনুকরণ মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই অনেকটা সম্ভবপর, কারণ, এই ছন্দে অক্ষর পরম্পরার গুণগত পার্থক্য সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার ন্যায় অনেকটা পরিস্ফুট হয়।

তান-প্রধান ছন্দ

যে ছন্দে অক্ষর-ধ্বনির অতিরিক্ত একটি টানা সুর বা তানই প্রধান হয়, তাহাকে **তান-প্রধান** ছন্দ বলে। আপাত দৃষ্টিতে মাত্রা-সংখ্যা সাধারণতঃ লিখিত অক্ষর অর্থাৎ বর্ণ বা হরফের সংখ্যানুযায়ী হয় বলিয়া এই ছন্দকে **অক্ষরমাত্রিক** বা **বর্ণ-মাত্রিক** ছন্দও বলা হইয়া থাকে। এই ছন্দে সাধারণতঃ প্রত্যেক syllable বা অক্ষরকে একমাত্রা ধরা হয়, অবশ্য শেষ হলন্ত অক্ষরকে দুই মাত্রা ধরা আবশ্যক। পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি মিত্রাক্ষর ছন্দ এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ এই জাতীয় ছন্দ।

পয়ার ছন্দ

যে ছন্দে প্রতি চরণে ১৪ মাত্রা, ৮ মাত্রা পরে অর্দ্ধযতি এবং ১৪ মাত্রা পরে পূর্ণ যতি, দুইটি চরণে স্তবক গঠিত এবং চরণ দুইটি পরস্পর মিত্রাক্ষর, তাহাকে **পয়ার ছন্দ** বলে। অতএব পয়ারে প্রতিচরণে

৮ মাত্রার ও ৬ মাত্রার দুইটি পর্ব্ব থাকে। রবীন্দ্রনাথ পয়ার ছন্দে ধ্বনিমাত্রা-সংখ্যা চৌদ্দ এর সহিত পূর্ণ যতির মাত্রা-সংখ্যা দুই ধরিয়া সর্ব্বসমেত ষোল মাত্রা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনিই দেখাইয়াছেন যে, পয়ারের বুনোনি ঠাসবুনোনি নয় বলিয়া তানপ্রধান ধর্ম্মবশতঃ স্বর যে কোনও জায়গায় টানিয়া বাড়াইয়া সাত মাত্রাও বাড়ান চলে, এবং তাহাতেও পয়ারের প্রকৃতি বজায় থাকে। এই জন্যও ছন্দের হিসাবে যতির মাত্রাসংখ্যা না ধরাই কর্ত্তব্য।

পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে মূল স্বরের ধ্বনিই প্রধান, ব্যঞ্জন-ধ্বনি অতি গৌণ। একটানা এক ধ্বনির প্রবাহ বা তানই এই ছন্দের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথ পয়ারের আশ্চর্য্য স্থিতিস্থাপকতা, ভারবহন শক্তি এবং গাম্ভীর্য্যের কথা বলিয়াছেন। স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম্মবশতঃ পয়ারের যে কোনও জায়গায় স্বর টানিয়া মাত্রা বাড়ান চলে। ভারবহন শক্তির জন্য যুক্তাক্ষরহীন পয়ারকে যুক্তাক্ষর-বহুল পয়ারে পরিবর্ত্তিত করা যায়, তাহাতে ছন্দের প্রকৃতি নষ্ট হয় না; বরং যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের প্রয়োগ-কৌশলে ছন্দে একটি ধ্বনির বিচিত্র তরঙ্গ সৃষ্ট হয়, ফলে পয়ারের একটানা চালের মধ্যেও প্রবল শক্তি সঞ্চারিত হয়। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই শক্তির বিচিত্র খেলা দেখাইয়াছেন। লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, স্থিতিস্থাপকতা গুণ বশতঃই ভারবহন শক্তি জন্মিয়া থাকে। বস্তুতঃ স্থিতিস্থাপকতা, ভারবহন শক্তি এবং গাম্ভীর্য্য পৃথক্ তিনটি গুণ নয়, সকলই পয়ারের প্রধান বৈশিষ্ট্য একটানা ধ্বনির প্রবাহ বা তান হইতে আসিয়া থাকে। স্বরের টান বশতঃই পয়ারের গতি মন্থর হয়, এবং তাহা হইতেই ছন্দে সংযম, গাম্ভীর্য্য ও প্রসার জন্মে। এইজন্যে উচ্চাঙ্গের কবিতা পয়ার জাতীয় ছন্দেই রচিত হইয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথ পয়ার জাতীয় ছন্দে আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহাতে যে কোনও পর্ব্বাঙ্গের পরেই উপচ্ছেদ, এমন কি পূর্ণচ্ছেদ পর্য্যন্ত বসান চলে।

উল্লিখিত মন্তব্য হইতে বুঝা যাইবে যে, মিত্রাক্ষর ছন্দে পয়ারই গদ্যের সমধিক নিকটবর্ত্তী, পয়ারের ও গদ্যের মাত্রানির্ণয় অনেকটা একই রীতি অনুসারে হইয়া থাকে।

প্রাচীন ও আধুনিক কালের পয়ার ছন্দের কবিতা বিশ্লেষণ করিলেই মন্তব্যগুলির সমর্থন পাওয়া যাইবে। কাব্যনির্ণয় গ্রন্থের ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় সাধারণ উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

পয়ারের বৈশিষ্ট্যের জন্যই পয়ার প্রাচীন ও আধুনিক যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমাদৃত ছন্দ; মহাকাব্য, নাট্যকাব্য ও খণ্ড কাব্যেও ইহার অবাধ ও বিচিত্র ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ

ত্রিপদী, চৌপদী, একাবলী, মালঝাঁপ প্রভৃতিও পয়ার-জাতীয় তান-প্রধান ছন্দ। কাব্যনির্ণয়গ্রন্থে উদাহরণ-সহ আলোচনা দ্রষ্টব্য; কেবল 'অক্ষর' স্থলে 'মাত্রা' বসাইলেই আধুনিক সঙ্কেত পাওয়া যাইবে।

লঘু ত্রিপদী—তিন পর্ব্বে ৬+৬+৮=২০ মাত্রার চরণ।

দীর্ঘ ত্রিপদী—তিন পর্ব্বে ৮+৮+১০=২৬ মাত্রার চরণ।

চৌপদী—চারি পর্ব্বে ৬+৬+৬+৫=২৩ মাত্রার চরণ

ইত্যাদি।

এই ছন্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য "তিনের ছন্দে গতির প্রাবল্যই বেশি, স্থিতি কম। সুতরাং তিনের ছন্দ চাঞ্চল্য প্রকাশের পক্ষে ভাল; কিন্তু তাতে গাম্ভীর্য্য ও প্রসারতা অল্প।"

মিশ্র ছন্দ

পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের বিচিত্র মিশ্রণে বিবিধ মিশ্রছন্দ সৃষ্ট হইয়া থাকে। কবি মধুসূদন সর্ব্বপ্রথমে ব্রজাঙ্গনাকাব্যে 'প্রতিধ্বনি' প্রভৃতি কবিতাতে ইহাকে অবতারিত করেন। রবীন্দ্র সাহিত্যে ইহার বিচিত্র লীলা দেখা যায়।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ

ইহার ভিত্তি তান-প্রধান প্রচলিত পয়ার-ছন্দের উপরে, কেবলমাত্র ইহাতে পয়ারের মিত্রাক্ষর-ধ্বনি নাই, এবং পয়ারের ন্যায় ছেদ যতির অনুগামী নহে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইংরাজী Blank Verse এর অনুবাদমাত্র। মধুসূদনও লিখিয়াছেন, তিনি ভাষাকে 'ভাবধনে' মণ্ডিত করিবার জন্য তাহার চরণের 'মিত্রাক্ষররূপ বেড়ী' ছেদন করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মিত্রাক্ষরের অভাব বা অমিত্রাক্ষরতা এই ছন্দের প্রধান লক্ষণ নহে। তিনি যথেচ্ছ ছেদ বসাইয়া পংক্তি-লঙ্ঘক বাক্যদ্বারা ভাবকে কবিতার চরণ-পরম্পরায় আবেগের তীব্রতানুসারে প্রবাহিত করাইয়াছেন। ছেদ-প্রয়োগের স্বাধীনতা অর্থাৎ পংক্তি-লঙ্ঘক বাক্যের প্রবহমাণতাই এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অনেকের ধারণা, এই ছন্দে ভাবচ্ছেদস্থলে যতি পড়িয়া থাকে, যতি পয়ারের অনুরূপ কেবলমাত্র ৮ মাত্রা ও ১৪ মাত্রায় পড়ে না। সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যে এরূপ চরণ প্রায় দুষ্প্রাপ্য যাহাতে ৮ম মাত্রা ও ১৪শ মাত্রার সঙ্গে একটি শব্দ সমাপ্ত হইয়া যায় নাই, অর্থাৎ ৮ম ও ১৪শ মাত্রায় যতি প্রয়োগে বাধা ঘটে। এই ছন্দকে ১৪ মাত্রায় না সাজাইয়া ১২, কি

১৬, কি ২০ মাত্রায় সাজান সম্ভবপর হইত না। এই ছন্দে প্রতি চরণ পয়ারের ন্যায় ৮ ও ৬ মাত্রার দুইটি পর্ব্বে বিভক্ত; কিন্তু অর্থ-বিভাগ ও ছন্দোবিভাগ অর্থাৎ ছেদ ও যতি সাধারণতঃ পরস্পর মিলিয়া যায় নাই। প্রচলিত পয়ারে এক একটি চরণ এক একটি অর্থ বিভাগ, দুইটি চরণের শেষে একটি বাক্য সম্পূর্ণ; এখানেই ভাব প্রকাশে ছন্দের অন্যায় শাসন। কবি মধুসূদন যতিকে পৃথক্ রাখিয়া, আবেগানুযায়ী চরণের আরম্ভে, মধ্যে, শেষে বা একক্রমে দুই তিন চার চরণ অতিক্রম করিয়া ভাবের তালে তালে বাক্যের সমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের যতিতে তাই শ্বাসের বিরাম হয় না, সংস্কৃত ছন্দের যতির ন্যায় একটী দীর্ঘ টান বা তানদ্বারা ধ্বনির প্রবাহ অব্যাহত থাকে; বাগ্‌যন্ত্রের বিরাম হয় ছেদ বা অর্দ্ধছেদ স্থলে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ পদ্য ও গদ্যের মধ্যবর্ত্তী ছন্দ; ইহাতে পদ্যের সৌন্দর্য্য, অলঙ্কার ও ধ্বনি আছে; আবার গদ্যের ভাবপ্রকাশের স্বাধীন লীলাও আছে। পয়ার ও গদ্যের মাত্রানির্ণয় অনেকটা এক রীতিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পয়ারে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এবং পংক্তির বাহিরে পদচারণা করিয়াছে বলিয়া গদ্যের ধর্ম্ম ইহাতেই সমধিক পরিস্ফুট।

পয়ারের যাহা দোষ, অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাহা বর্জ্জিত; পয়ারের যাহা গুণ, অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাহা চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত।

প্রচলিত পয়ারের দুইটি বন্ধন,—মিত্রাক্ষরবেড়ী ও ছেদ-যতির ঐক্য। অমিত্রাক্ষরছন্দে মিত্রাক্ষর বা অন্ত্যানুপ্রাস নাই; কাজেই মিলের খাতিরে উপযুক্ত শব্দকে বর্জ্জন করিতে হয় না, মিলযুক্ত শব্দ দিবার জন্য ভাবপ্রকাশের চেষ্টা ব্যাহত হয় না। অন্ত্যানুপ্রাস না থাকিলেও 'হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার' প্রভৃতি অনুপ্রাসের ন্যায় অনেক অন্তপ্রাস

চরণ-মধ্যে থাকে ; তাহাতেই ধ্বনির ঝঙ্কার কাব্যসঙ্গীত ও কাব্য-সৌন্দর্য্যকে পরিপুষ্ট করে ।

ছেদ-যতির অনৈক্য দ্বারা চরণ পরম্পরায় ভাব-ধারাকে মুক্তি দিবার কথা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কবিগণ ভাবচ্ছন্দের সমতালে ভাষাকে প্রবাহিত করিয়া তাহাতে নানা ওজনের নানা সুর সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কাব্যে ভাব ও সঙ্গীত ধর্ম্মের পরিস্ফুট প্রকাশ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দই শ্রেষ্ঠ ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভটি পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিতরূপে তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন ।

"......এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামত ছোট বড় নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন, কোন জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেন্‌নি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীরমর্য্যাদা সুগম্ভীর হয়ে বাজল—"সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু।" তারপরে তার অকালমৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙ্গা রণ-পতাকার মত ভাঙ্গা ছন্দে ভেঙ্গে পড়্‌ল—"চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে।" তারপরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে, 'কহহে দেবি অমৃতভাষিণী'। তারপরে আসল কথাটা যেটা সবচেয়ে বড় কথা—সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘ-গর্জ্জনের মত এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হ'ল—"কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি।"

—প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫

পয়ারে যে কোন পর্ব্বাঙ্গের পরে—২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১০, ১১, ১২ বা ১৪ মাত্রার পরে যে অর্দ্ধচ্ছেদ এমনকি পূর্ণচ্ছেদ পর্য্যন্ত বসান চলে, উল্লিখিত অমৃতাক্ষরছন্দেই তাহার সূক্ষ্ম ও ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায় ।

পয়ারের অপর গুণ স্থিতিস্থাপকতা এবং ভারবহনশক্তি, ধ্বনির দিক

দিয়া গাম্ভীর্য্য। এই সমস্ত গুণেরও শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ অমিত্রাক্ষর ছন্দে-উচ্চারণের মানমর্য্যাদাযুক্ত ধ্বনিবহুল সংস্কৃতভাষার কুলীন শব্দ ব্যতীত যুক্তাক্ষর-বিহীন হাল্‌কাচালের বাঙ্গালা শব্দে অমিত্রাক্ষরছন্দের অক্ষুন্ন গাম্ভীর্য্য, প্রচণ্ড গতিশীলতা এবং বীর-ভঙ্গিমা রক্ষিত হইতে পারেনা। মধুসূদন কেন যে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার কৌশলটি এখানে পাওয়া যায়। সংস্কৃত শব্দের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ বাঙ্গালায় নাই বটে, কিন্তু তাহার যুক্তাক্ষরের আঘাত বাঙ্গালায় সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়। ধ্বনির অসাম্যই ছন্দে তরঙ্গের সঞ্চার করে। ইংরাজীতে এই অসাম্য আসে একসেণ্ট-বিদ্ধ শব্দ হইতে, সংস্কৃতে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ হইতে। খাটি বাঙ্গালা শব্দগুলি বাঙ্গালা দেশের ন্যায় কোমল, মসৃণ ও সমতল বলিয়া সংস্কৃত শব্দের যুক্তবর্ণের ধ্বনি-ঝঙ্কার-দ্বারা অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিচিত্র শক্তি সৃষ্টি করা হয়। 'ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড টঙ্কার' প্রভৃতি পদ এই কথারই পরিচায়ক। পয়ারের স্থিতিস্থাপকতা ও ভারবহনশক্তি গুণের জন্যই অমিত্রাক্ষর ছন্দের এই শক্তি।

উদাহরণ :—

সম্মুখ সমরে পড়ি, । বীরচূড়ামণি ॥
বীরবাহু, চলি যবে । গেলা যমপুরে ॥
অকালে, কহ, হে দেবি, । অমৃতভাষিণি ! ॥
কোন্‌ বীরবরে বরি । সেনাপতি পদে ॥
পাঠাইলা রণে পুনঃ । রক্ষঃ কুলনিধি ॥
রাঘবারি ?

—মেঘনাদবধ কাব্য

ছেদ-প্রয়োগে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নবীন চন্দ্র সেন প্রভৃতি কবির অমৃতাক্ষরছন্দে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হইবে। হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর স্থলে স্থলে একেবারে মিলশূন্য পয়ারে পরিণত হইয়াছে ; যথা—

জাগ্রত কি দানবারি। সুরবৃন্দ আজ ? ॥
জাগ্রত কি অস্বপন। দৈত্যহারী দেব ? ॥
দেবের সমরক্লান্তি। ঘুচিল কি এবে ? ॥
উঠিতে সমর্থ কিহে। সকলে এখন ? ॥

গৈরিশ ছন্দ

গিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রবর্ত্তিত এই ছন্দ তাঁহার নামানুসারে গৈরিশছন্দ নামে পরিচিত। মিত্রাক্ষর নাই বলিয়া ইহাও অমিত্রাক্ষর ছন্দ, কিন্তু মধুসূদন-প্রবর্ত্তিত ছন্দ হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য অন্যরূপ। এই ছন্দ সাধারণতঃ প্রত্যেকটি চরণে সম্পূর্ণ, পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী চরণের সহিত ইহার সংশ্লেষ প্রায়ই দেখা যায় না। প্রত্যেকটি চরণ দুইটি পর্ব্বে গঠিত হইয়া থাকে, পর্ব্ব দুইটিতে মাত্রাসংখ্যা কখন কখন সমান থাকে, তবে প্রায়ই অসমান হয়, দ্বিতীয় পর্ব্বে অতিরিক্ত শব্দ থাকিয়া ছন্দকে ক্ষিপ্রতর ও হিল্লোলিত করে। প্রত্যেক চরণের শেষে পূর্ণ যতির সঙ্গে সঙ্গে ছেদ পড়িবেই ; অর্দ্ধচ্ছেদ চরণের মধ্যেও পড়িতে পারে, কিন্তু পূর্ণচ্ছেদ চরণের শেষেই পড়িয়া থাকে। কাজেই এই ছন্দে প্রত্যেকটি চরণই একটি পূর্ণ অর্থ-বিভাগ। ভাবের আবেগ ও গাম্ভীর্য্য অনুযায়ী বিভিন্ন চরণে অল্প বা অধিক মাত্রার ছোট বা বড় পর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রথম পর্ব্বে ২, ৪, ৬ মাত্রা এবং দ্বিতীয় পর্ব্বে ৬, ৮, ১০ মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়। প্রথম পর্ব্বেও কখন কখন ৮ মাত্রা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উদাহরণ :—

(১) দেখ ।—দেখ,
গৈরিক বসন, । প্রশান্ত বদন,
কমণ্ডলুকরে ।—ধীরে করে আগমন !
কহ মোরে । এ রহস্য কিবা ?

—বুদ্ধদেব

(২) কহ সত্য, । ছন্দক, আমায়,
একি এই । অভাগার কুলরীতি ?
কিংবা সবাকার । ওই পরিণাম ?
মহানিদ্রাকোলে । আমিও কি করিব শয়ন ?

—বুদ্ধদেব

(৩) মহাকার্য্যে যদি মম । তনু হয় ক্ষয়,
মৃত্যুকালে । প্রবোধিব মনে,
যথাসাধ্য । করেছি উদ্যম ।

—বুদ্ধদেব

প্রবহমাণ পয়ার

রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন-প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ছেদ-প্রয়োগের কৌশলটুকু আয়ত্ত করিয়া পয়ার ছন্দে স্বাধীনভাবে ভাবধারাকে প্রবাহিত করিয়াছেন। এইজন্য ইহার নাম প্রবহমাণ পয়ার ছন্দ দেওয়া যাইতে পারে। 'অহল্যার প্রতি', 'মেঘদূত', 'যেতে নাহি দিব', 'বসুন্ধরা', 'মানসসুন্দরী' প্রভৃতি কবিতায় ইহার সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখা যায় ; যথা,—

আজ কোনো কাজ নয়। সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবন্ধগ্রন্থগীত। এস তুমি প্রিয়ে,
আজন্ম-সাধন-ধন। সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনা-লতা। শুধু একবার
কাছে ব'স। আজ শুধু। কূজন গুঞ্জন
তোমাতে আমাতে শুধু। নীরবে ভুঞ্জন

—মানস সুন্দরী

অমিত্রাক্ষর ছন্দের সহিত ইহার পার্থক্য কেবলমাত্র মিত্রাক্ষরে। তবে পূর্ণচ্ছেদ দুই তিন এমন কি দশ পংক্তি লঙ্ঘন করিয়াও অনেক সময়ে বাক্যশেষে বসে ; বাক্যমধ্যে পূর্ণচ্ছেদ পড়িলে তাহা যুগ্ম-সংখ্যক মাত্রার পরে বসে, 'মেঘদূত' কবিতাটি পরীক্ষা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

মহাপয়ার

ইহা অবিকল প্রবহমাণ পয়ারের লক্ষণান্বিত, কেবলমাত্র ইহার চরণ ১৮ মাত্রার, ৮ ও ১০ মাত্রার দুইটি পর্ব্বে গঠিত। ইহাই পয়ারশ্রেণীর প্রশস্ততম ছন্দ বলিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহার নাম রাখিয়াছেন মহাপয়ার। কবি দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহার 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্যে এই ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি', 'এবার ফিরাও মোরে' প্রভৃতি কবিতা এই ছন্দে রচিত। ইহাতে মিল থাকিলেও ছেদ-প্রয়োগের স্বাধীনতা এবং ভাবের পংক্তি-লঙ্ঘক প্রবাহ আছে।

অসম ছন্দ

ইহা মিত্রাক্ষর ছন্দ ; কিন্তু ইহাতে নিকটবর্ত্তী দুইটি চরণ অসমান ; প্রত্যেক চরণ যে দুইটি পর্ব্বে বিভক্ত হয়, তাহারাও প্রায়ই অসমান,

এই জন্য এই ছন্দের নাম অসম ছন্দ। ইহাতে ছন্দের যাবতীয় কৃত্রিম বন্ধনের অবসান ঘটিয়াছে মনে করিয়া কেহ কেহ ইহার নাম মুক্তক ছন্দ রাখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলাকায় এই ছন্দের প্রথম অবতারণা করিয়াছেন। উদাহরণ :—

হে বিরাট। নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ। তব জল
অবিচ্ছিন্ন। অবিরল
চলে। নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য। তব রুদ্র কায়াহীন বেগে,
বস্তুহীন প্রবাহের। প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা। উঠে জেগে,
আলোকের তীব্রচ্ছটা। বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণ-স্রোতে
ধাবমান। অন্ধকার হ'তে।

—চঞ্চলা

(২) সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি। ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'ল,। যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা। তলোয়ার।
দিনের ভাটার শেষে। রাত্রির জোয়ার
এল তা'র ভেসে-আসা। তারাফুল নিয়ে কালো জলে,
অন্ধকার। গিরিতটতলে

—বলাকা

এই ছন্দে দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয় যে কোন সংখ্যক চরণ লইয়া স্তবক গঠিত হইতে পারে। সাধারণতঃ পার্শ্ববর্ত্তী দুইটি চরণে মিল,

কখন ক্রমান্বয়ে তিনটি চরণে মিল, কখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণ অতিক্রম করিয়া প্রথম ও চতুর্থ চরণে মিল ; কখন বা মিল-শূন্য একটি চরণ মাঝে দাঁড়াইয়া থাকে। চরণগুলিতে দুইটি করিয়া পর্ব্ব, সাধারণতঃ অসমান কিন্তু যুগ্ম মাত্রার। পার্শ্ববর্ত্তী মিলযুক্ত চরণদ্বয়ের মাত্রা সংখ্যাও প্রায়ই সমান থাকে না। ভাবের বৈচিত্র্য ও আবেগের সঙ্গে চরণও দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে থাকে। ছেদ প্রায় সকলস্থলেই চরণের অন্তে পড়িয়া থাকে, অর্দ্ধছেদ ক্বচিৎ চরণের মধ্যে প্রথম পর্ব্বশেষে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাভাবিক ছন্দের স্পন্দন (Rhythm), পর্ব্বে যুগ্মসংখ্যক মাত্রা এবং মিল এই ছন্দের স্বরূপ।

গদ্য ছন্দ

আমেরিকার শক্তিশালী কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের রচনার আদর্শে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালায় এই ছন্দ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ছন্দে গাঁথা এ কবিতা নয়, ইহা গদ্যধর্ম্মের কবিতা। গদ্যধর্ম্মের যে কবিতা তার একটি বিশেষত্ব এই যে, যেটা নিজের মনের কথা সেটা সহজে বলা যায়। পদ্যে—অলঙ্কার, মিল, ছন্দের মধ্য দিয়ে অনেক কথা বলা যায় না—বাধা পায়।"

অসমছন্দের যতি ও পর্ব্ব-বিভাগ এখানে লুপ্ত, মিলও নাই, ইহা তাই মিত্রাক্ষরও নহে, অমিত্রাক্ষরও নহে, গদ্য ; কিন্তু rhythm বা ছন্দের স্পন্দন অনুভব করা যায় বলিয়া ইহা ছন্দ। বাস্তবিক পক্ষে ইহা গদ্যই, কারণ, ছন্দের স্পন্দন সুলিখিত গদ্য-রচনা মাত্রেই দেখা যায়। এখানে বাহ্য ভাষায় ছন্দের কোন লক্ষণ নাই, ছন্দের সাধারণ একটি কাঠামোও দেখা যায় না। ছন্দ ধরা পড়ে অন্তরের ভাবে, ভাববিন্যাসের শিল্পে ; এই জন্যে এই ছন্দ মুখ্যতঃ ভাবেরই ছন্দ। ভাবের উদ্দীপনা ও রসের

নিষ্পত্তিতে সার্থকতা বলিয়া রচনার দিক্ হইতে ইহা কাব্য; ছন্দ তাই এখানে নিগূঢ় মর্ম্মগত, ভাববিন্যাসে প্রচ্ছন্ন আবেগের যে ব্যঞ্জনা হয়, তাহাই ইহার প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথকৃত ওয়াল্ট হুইটম্যানের একটি কবিতার অনুবাদ হইতে প্রথম উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে,—

লুইসিয়ানাতে দেখলুম। একটি তাজা ওক গাছ। বেড়ে উঠচে;।
একলা সে দাঁড়িয়ে,। তার ডালগুলো থেকে। শ্যাওলা
পড়চে ঝুলে॥
কোনো দোসর নেই তার, ঘন সবুজ পাতায় কথা কইচে
তার খুসি।
তার কড়া কড়া তেজালো চেহারা মনে করিয়ে দিলে
আমারই নিজেকে।
অশ্চর্য্য লাগল কেমন করে এ গাছ ব্যক্ত করচে খুসিতে ভরা
আপন পাতাগুলিকে।

প্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই রচনার আবেদন বুদ্ধির দ্বারে নয়, অন্তরের দ্বারে, ইহা তাই কাব্য। শব্দবিন্যাসে সুপ্রত্যক্ষ অলঙ্করণ না থাকিলেও শিল্প আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "যতই সামান্য হোক, এর মধ্যে বাক্য-সংস্থানের একটা শিল্পকলা শব্দ-ব্যবহারের একটা 'তেরছ চাহনি' রাখতে হয়েচে।" এখানে পূর্ণচ্ছেদ পর্য্যন্ত এক একটি বাক্যই প্রকৃতপক্ষে এক একটি পংক্তি, শোভার জন্য বাক্যের শেষাংশ পৃথক্‌ভাবে রাখা হইয়াছে মাত্র। প্রত্যেকটি বাক্যকে গদ্য বাক্যের ন্যায় অর্থবাচক বিভিন্ন বাক্যখণ্ডে বিভক্ত করা যায়, এক একটি বাক্য-